জুল ভার্নের

রহস্যের দ্বীপ

রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

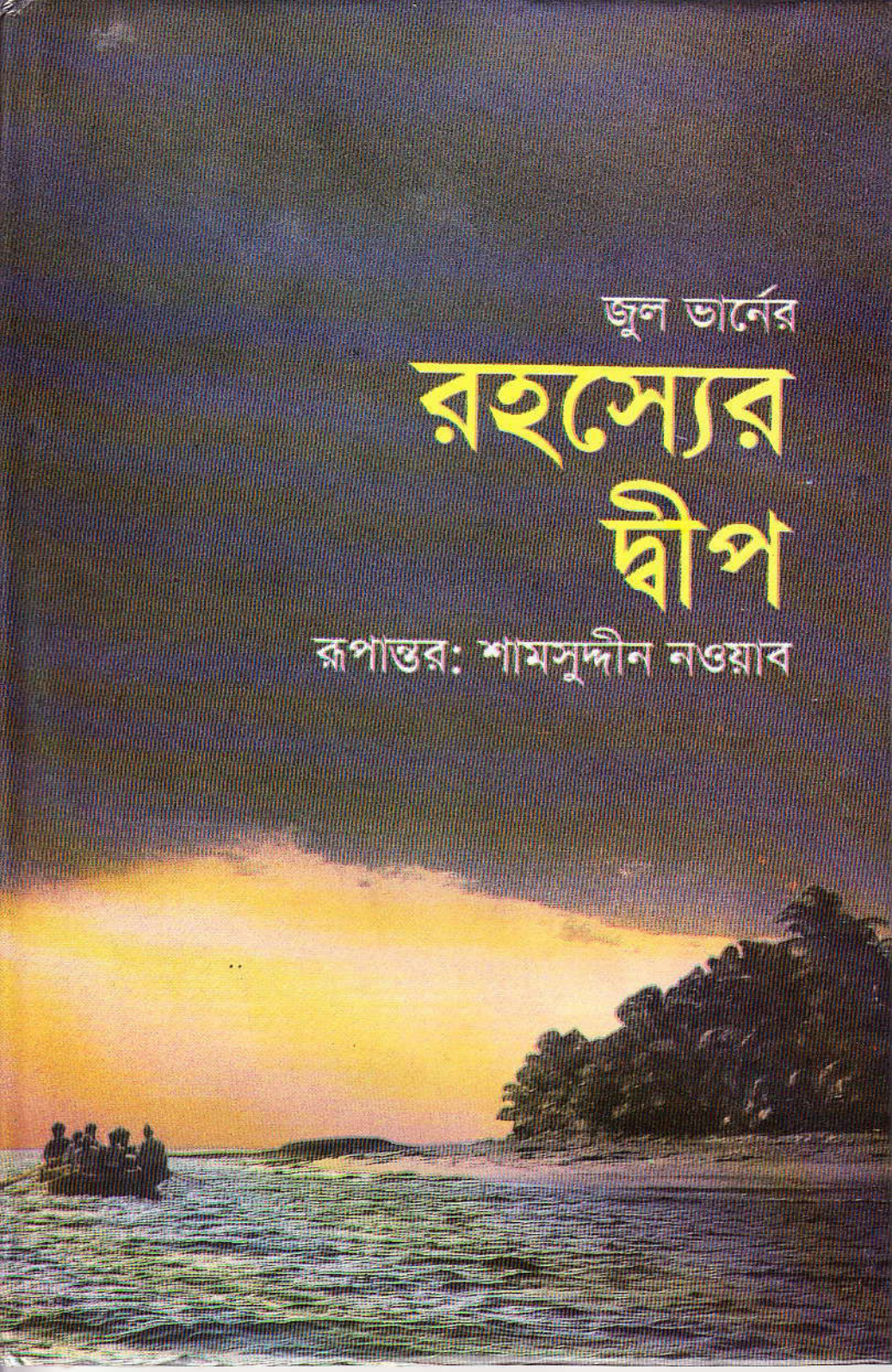

জুল ভার্ন

রহস্যের দ্বীপ

রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

১৮৬৫ সালের ২৪ মার্চ।
প্রশান্ত মহাসাগরের এক নির্জন দ্বীপে বিধ্বস্ত হলো ঝড়ের কবলে পড়া এক আমেরিকান বেলুন। কেউ নেই দ্বীপে। শুধু পাঁচজন অভিযাত্রী, সাথে একটি কুকুর। না আছে খাবার, না অস্ত্র, না বাড়তি জামা-কাপড়— কিচ্ছু না।

শুরু হলো ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর নেতৃত্বে ওদের টিকে থাকার সংগ্রাম। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওদের জীবনযাত্রা।
সবাই টের পাচ্ছে, বিপদে-আপদে
কে যেন অলক্ষে সাহায্য করে যাচ্ছে ওদের।
একের পর এক ঘটে চলেছে রহস্যজনক কাণ্ড-কারখানা।
পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ওরা ছাড়াও নিশ্চয়ই আরও কেউ রয়েছে এই দ্বীপে। কিন্তু সামনে আসে না কিছুতেই।

কে সে?
কোন অপদেবতা, নাকি মহামানব?

জুল ভার্নের
বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী

রহস্যের দ্বীপ

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রজাপতি প্রকাশন

রহস্যের দ্বীপ

প্রজাপতি প্রকাশন থেকে
আরও ক'টি বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী

কাজী শাহনূর হোসেন

সবুজ মানব, মরা মানুষের শহর, অশুভ পিরামিড, গুহামানবের কবলে, সাগরপিশাচ, মৃত্যু-রোবট, মহাকাশে বন্দী, অন্ধকূপের রহস্য, আঁধারের আততায়ী, কয়লাখনির আতঙ্ক।

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

অশুভ শক্তি।

জুল ভার্ন/শামসুদ্দীন নওয়াব

বেগমের রত্নভাণ্ডার, বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ, নোঙর ছেঁড়া, মাইকেল স্ট্রগফ।

আশিদিনে বিশ্বভ্রমণ, মরু-শহর, পাতাল অভিযান, মাস্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড, নাইজারের বাঁকে, সাগর তলে, গুপ্তরহস্য, কার্পেথিয়ান দুর্গ, চাঁদে অভিযান, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

'ওপরে কি উঠছি আমরা?'

'মোটেই না।'

'নামছি?'

'তার চেয়েও ভয়ানক অবস্থা, ক্যাপ্টেন। আমরা পড়ছি।'

'বোঝা হালকা করো।'

'অনেক আগেই করা হয়েছে।'

'তবুও উঠছে না বেলুন?'

উত্তর নেই।

ঝোড়ো হাওয়ার হুঙ্কার ছাপিয়ে আবার এই প্রশ্নটাই করল আরেকজন, 'অল্প অল্প করেও কি ওপরে উঠছে না বেলুন?'

'একেবারে না। আরে! নিচে সাগরের গর্জন শোনা যাচ্ছে না?'

কথাটা শেষ হবার সাথে সাথে আর একটি উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'সেরেছে! সমুদ্র তো আর পাঁচশো ফুটও নিচে নয়।'

'ফেল, ফেল। মালপত্র সব ফেলে দাও। গোলাবারুদ, বন্দুক, বালির বস্তা, খাবার দাবার সব, সব ফেল।'

সেদিন ১৮৬৫ সালের তেইশে মার্চ। বিকেল প্রায় চারটায় দিগন্ত বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশে শোনা গিয়েছিল উত্তেজিত এই ক'টি কণ্ঠ। ওই বছরের ১৮ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত বয়ে যাওয়া সেই ভয়ঙ্কর ঝড় পরবর্তীকালে কিংবদন্তীর রূপ নেয়। সেই প্রচণ্ড ঝড়ে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার অনেক জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়, উপড়ে পড়ে বিশাল সব গাছপালা। তীরে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যায় প্রায় শতখানেক জাহাজ। আর প্রাণহানী যে কত হয়েছে তার হিসেব নেই।

ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পাক খেতে খেতে পড়ছিল একটা বিশাল বেলুন। বেলুনটার সর্বাঙ্গ দড়ির জালে মোড়া। তলায় ঝোলানো দোলনায় পাঁচজন আরোহীর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না ঘন কুয়াশার জন্যে। পথ হারানো বিশাল বেলুনের গায়ে ফুটো হয়ে গেছে। হু হু করে গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে ক্রমেই চুপসে লম্বাটে হয়ে আসছে গোল বেলুন। নিচে ফুঁসছে সাগর। উথাল পাতাল ঢেউয়ের উপর আছড়ে পড়তে যাচ্ছে বেলুনের আরোহীরা। অথচ ধারে কাছে ডাঙা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না কুয়াশার জন্যে।

২৪ মার্চ সকাল। আরও চুপসে গেছে বেলুন।

'এবার কি করব?' জিজ্ঞেস করল একজন। উত্তর দিল না কেউ।

আরও নিচে নেমে এল বেলুন।

'পানিতে ডুবেই মরব তাহলে?' বলল আর একজন।

'দূর! এত ভেঙে পড়ার কি আছে?' আশ্বাস দিল তৃতীয় জন, 'সব জিনিসই কি ফেলে দেয়া হয়েছে?'

'না, চার হাজার ডলার ভর্তি থলেটা এখনও আছে।' কথা শেষ হবার সাথে সাথেই দোলনা থেকে ছিটকে বাইরে পড়ল কাঁচা টাকার বস্তা। সামান্য উপরে উঠল বেলুন, কিন্তু বেশ বোঝা গেল একটু পরই নামতে শুরু করবে আবার। অথচ ফেলার মত আর কিছু নেই বেলুনে।

হঠাৎ মনে করিয়ে দিল একজন, 'দোলনাটা তো ফেলা হয়নি এখনও!'

ভারি উইলো কাঠের তৈরি দোলনাটা। পানিতেও ভাসবে না। সাথে সাথেই কাজে লেগে গেল অভিযাত্রীরা। বেলুনের গায়ে মোড়া দড়ির জালের সঙ্গে নিজেদের ভাল করে বেঁধে নিয়ে দোলনার দড়ি কেটে দিল ওরা। দোলনা ফেলতেই অনেক হালকা হয়ে গেল বেলুন। এক লাফে উঠে গেল হাজার ফুট। কিন্তু তাতেই বা কি? অতবড় ফুটো দিয়ে গ্যাস বেরোতে থাকলে কতক্ষণ আর টিকতে পারে বেলুন? অল্পক্ষণ পরই টলমল করে নামতে নামতে বিকেল চারটে নাগাদ আবার পানির শ'পাঁচেক ফুট উপরে নেমে এল সেটা।

এমন সময় ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাতে শুরু করল কুকুরটা।

'কিছু দেখল নাকি টপ?' বলল একজন।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল আর একজন, 'ডাঙা! ডাঙা! ওই যে, ডাঙা দেখা যাচ্ছে।'

শেষ পর্যন্ত সত্যিই ডাঙার দেখা মিলল। একেবারে বেলুনের গতিপথেই। আর মাত্র ঘণ্টাখানেক টিকে থাকতে পারলেই মাইল তিরিশেক দূরের স্থলভূমিতে পৌঁছে যেতে পারবে ওরা। কিন্তু একঘণ্টা টিকবে কি বেলুন? আরও বেরিয়ে গেল বেলুনের গ্যাস। সাগরের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে চলল বেলুন। তলার দিকটা পানির ঝাপটায় ভিজে গেছে। আরোহীরাও শুকনো নেই কেউ। সাঁতার কাটার সুবিধের জন্যে শরীর থেকে বাঁধন খুলে ফেলার হুকুম দিলেন নেতা।

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মাঝে কাটল আরও আধঘণ্টা। হঠাৎ একটা ঘূর্নি হাওয়ার ধাক্কায় বেশ খানিকটা উপরে লাফিয়ে উঠল বেলুন। দড়ি ধরে ঝুলে রইল আরোহীরা।

তীরে পৌঁছতে আর মাত্র আধ মাইল বাকি। বাঁচার আশা ফিরে এল আরোহীদের মনে। একটু পরই দুলতে দুলতে বালুকাবেলায় এসে পড়ল বেলুন। জালের দড়ি ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নিচে নামল আরোহীরা। একসাথে এত ওজন কমে যাওয়াতে ছিটকে আকাশে উঠে গেল প্রায় চুপসানো বেলুন। সাঁ সাঁ করে চোখের আড়ালে উধাও হয়ে গেল ঝোড়ো বাতাসের ধাক্কায়। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হলো না আরোহীরা। খুশিতে থেই থেই করে নাচতে শুরু করল সবাই। হঠাৎ মুখের হাসি মিলিয়ে গেল সবার।

ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং আর তাঁর প্রিয় কুকুর টপ ওদের মাঝে নেই।

দুই

গৃহযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা চলছে তখন সমস্ত আমেরিকা জুড়ে। রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার সংকল্প নিয়ে ১৮৬৫ সালের মার্চের মাঝামাঝি রিচমণ্ড শহর অবরোধ করে বসলেন জেনারেল গ্র্যান্ট। জোর লড়াই করেও কিন্তু তিনি রিচমণ্ড দখল করতে পারলেন না। শহরের মধ্যেই বন্দী হয়ে আছেন জেনারেলের কয়েকজন ঝানু অফিসার। ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং এদের অন্যতম। ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের এই ক্যাপ্টেনের বয়স পঁয়তাল্লিশ। পাথর খোদাই করা চেহারা। প্রখর বুদ্ধি আর তীব্র মনের জোর ভদ্রলোকের। কদমছাঁট চুল, ধূসর পুরু গোঁফ, সুগঠিত করোটি, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় ওঁর মাঝে আছে দুর্জয় সাহস, অদম্য মনোবল আর তীব্র ইচ্ছাশক্তি। গাঁইতি আর হাতুড়ি চালিয়ে হাতেখড়ি নিয়েছেন

তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায়—শুধু কাগজ-কলমে নয়।

সাইরাস হার্ডিং-এর সাথেই গ্রেফতার হয়েছেন নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডের চীফ রিপোর্টার গিডিয়ন স্পিলেট। বিশাল শরীরের অধিকারী এই সাংবাদিকের বয়স চল্লিশ। ঠাণ্ডা মাথা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রচণ্ড সাহস, অপরিসীম উদ্যোগ আর উৎসাহ এঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে উন্নতির শিখরে। যুদ্ধক্ষেত্রে এক হাতে পিস্তল ধরে অন্য হাতে খবর লেখায় অভ্যস্ত বলে খ্যাতি আছে তাঁর।

ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং আর সাংবাদিক গিডিয়ন স্পিলেট পরস্পরকে না চিনলেও দু'জনের নামডাকই দু'জনের কানে গিয়েছিল। শহরের বাইরে যাবার নির্দেশ নেই, তবে শহরের চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারতেন দু'জনেই। এভাবেই হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে যায় ওঁদের। এরপর থেকে উভয়েই পালাবার ফিকির খুঁজতে শুরু করলেন।

এরই মাঝে একদিন চালাকি করে শহরে ঢুকে পড়ল ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর পুরানো ভৃত্য নেব—অর্থাৎ নেবুশ্যাডনেজার। অত্যন্ত প্রভুভক্ত নেবকে বহু আগেই দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন হার্ডিং। কিন্তু ভূতপূর্ব মনিব শত্রুদের হাতে পড়েছেন শুনে জান বাজী রেখে ছুটে এসেছে নেব। সাথে করে নিয়ে এসেছে হার্ডিং-এর প্রিয় কুকুর টপকেও।

মহা ফাঁপরে পড়লেন রিচমণ্ডের শাসনকর্তা জেনারেল লী। জেনারেল গ্র্যান্ট শহর অবরোধ করে বসে থাকায় তিনি বাইরে থেকে খবর আনা নেয়া করতে পারছেন না। হুকুম পাঠাতে পারছেন না অন্যান্য সেনাপতিদের কাছে। কাজেই, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে একটা বেলুন বানালেন জেনারেল লী। তাঁর জনাকয়েক লোককে বেলুনে করে পাঠিয়ে দেবেন অন্যান্য সামরিক অফিসারদের কাছে। বেলুনের তলায় বাঁধা বিশাল দোলনায় বসবে তারা।

কিন্তু বেলুন ওড়ানোর দিনই ঘটল অঘটন। মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল সারা আকাশ। তার উপর বাতাসের ঝাপটা। প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস এসব।

রিচমণ্ড ছেড়ে পালাবার কথা মনে মনে ভাবছিল আরও একজন—নাবিক পেনক্র্যাফট। ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর সাথে পরিচয় আছে পেনক্র্যাফটের। বেলুনের কাছে দাঁড়িয়ে সেদিন অদ্ভুত আকাশ যানটাকে দেখছিল পেনক্র্যাফট। এমন সময় কথাটা কানে গেল ওর। ক্যাপ্টেন ফরেল্টারকে বলছেন জেনারেল লী, 'এই আবহাওয়ায় তো আকাশে ওড়ানো যাবে না বেলুন।'

'অবস্থা দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।' চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন ফরেল্টার, 'এ ঝোড়ো হাওয়ায় না বেরিয়ে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক।'

ঠিক হলো, পরদিন সকালে হাওয়ার জোর কমলে রওনা হওয়া যাবে। রাতে বেলুনের কাছে খুব একটা কড়া পাহারার দরকার হবে না। এই ঝড়-তুফানের ভেতর বেলুনের কাছে কারও আসার সম্ভাবনা নেই। কথা শুনে মনে মনে হাসল পেনক্র্যাফট। এক্ষুণি ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিংকে কথাটা জানানো দরকার। পালাবার এই সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না ভেবে তক্ষুণি ক্যাপ্টেনের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল সে।

রাস্তায়ই পাওয়া গেল ক্যাপ্টেনকে।

'পালাবার সুযোগ এসে গেছে, ক্যাপ্টেন,' বলল পেনক্র্যাফট।

'সুযোগ! এর মাঝে কি ব্যবস্থা করে ফেললে তুমি, পেনক্র্যাফট।'

'বেলুন।'

'তাইতো! আরে, কি বোকা আমি! জেনারেলের বেলুনের কথা শুনেও

এতদিন প্ল্যানটা আমার মাথায় ঢোকেনি!'

কথা বলতে বলতে গিডিয়ন স্পিলেটের কাছে চলে গেলেন দু'জনে। ঠিক হলো রাত দশটায় পালাবেন ওঁরা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন ক্যাপ্টেন, 'হে খোদা, তুফান যেন আজ না কমে।'

যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হলো। নিজেদের জিনিসপত্র গোছগাছ করতে চলে গেল সবাই। জিনিসপত্র গুছাতে গুছাতে কুকুরটাকে জিজ্ঞেস করলেন হার্ডিং, 'কিরে, আকাশে উড়তে ভয় করবে নাতো তোর?' উত্তরে শুধু ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে চেয়ে লেজ নাড়ল কুকুরটা।

একটু পরই জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছলেন স্পিলেট। আর দেরি না করে কুকুরটা সহ বেরিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন হার্ডিং, স্পিলেট আর নেব। বেলুনের কাছে পৌঁছে দেখলেন পাহারার চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। বাতাসের ঝাপটায় কাত হয়ে উড়ছে বেলুন। যে কোন মুহূর্তে খুঁটি উপড়ে আকাশে উড়ে যেতে পারে।

অন্ধকারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎকণ্ঠিত পেনক্র্যাফট। সাথে বিশ বছরের একটা ছেলে। ওর প্রাক্তন মনিবের ছেলে—হার্বার্ট। ব্যবসার উদ্দেশ্যে রিচমণ্ডে এসেছিল দু'জনে। ক্যাপ্টেনের দেরি দেখে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে পেনক্র্যাফট, এমন সময় ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল টপ। এসে গেছেন ক্যাপ্টেন। হার্বার্টকে নিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে দৌড়ে গেল পেনক্র্যাফট। হার্বার্টের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'আমার মনিবের ছেলে—হার্বার্ট। বাবার মৃত্যুর পর বাজে লোকের পরামর্শে পড়ে ব্যবসা বাণিজ্য সব খুইয়ে প্রায় পথে বসেছে ও,' বলল পেনক্র্যাফট। 'এখন আছে আমার সাথে আমার সহকারী হিসেবে।'

আশেপাশে আর একবার ভাল করে দেখে নিল সবাই। নাহ, পাহারাদারের চিহ্নও নেই। একে একে দোলনায় উঠে বসল অভিযাত্রীরা। একটা একটা করে খুঁটির দড়িগুলো কেটে দেয়া হলো। এদিক ওদিক দুলতে দুলতে তীরবেগে শূন্যে উঠে গেল বিশাল বেলুন।

সেদিন ছিল আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালের বিশে মার্চ। রাত দশটা।

তিন

'কোথায় গেলেন ক্যাপ্টেন?' নিবিড় অন্ধকারে গিডিয়ন স্পিলেটের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন শোনা গেল।

পানিতে পড়ে গেলেন কি তিনি? নাকি বেলুন থেকে নামারই সুযোগ পাননি? চারজন লোক নেমে পড়ায় হালকা হয়ে যাওয়া বেলুন হয়তো তাঁকে নিয়েই শূন্যে উধাও হয়ে গেছে। পানিতে পড়ে গিয়ে থাকলে উন্মত্ত ঢেউয়ের বুকে সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছুনো অসম্ভব। তবুও—স্পিলেট বললেন, 'চলো, খোঁজ করে দেখি।'

ঘুটঘুটে অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না, তবুও হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগল অভিযাত্রীরা। বেলুনটা যেদিক থেকে উড়ে এসেছে সেদিকেই রওনা হলো সবাই। একটু পর পরই কেউ না কেউ ক্যাপ্টেনের নাম ধরে ডাকছে। সব চেয়ে অস্থির নেব। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল সে, 'ক্যাপ্টেনকে ছাড়া এই অজানা দ্বীপে বেশিদিন টিকতে পারব না আমরা। এখন ওঁকে জীবন্ত পাওয়া গেলে হয়।'

প্রত্যেকের মনেই দেখা দিয়েছে দুর্ভাবনাটা। উতলা হয়ে ভাবছে সবাই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা। এত হাঁক ডাকেরও কোন জবাব নেই। এক সময় হার্বার্ট বলল, 'কোথাও জখম হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে নেই তো ক্যাপ্টেন?'

হঠাৎ বুদ্ধি বের করল পেনক্র্যাফট। বলল, 'যাওয়ার পথে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে গেলে একটা পথের নিশানা থেকে যাবে ক্যাপ্টেনের জন্যে। জ্ঞান ফিরে এলে, নিশানা দেখে তিনি ঠিকই বুঝবেন কোন পথে এগুচ্ছি আমরা।'

কথাটা পছন্দ হলো স্পিলেটের। নেবকে বললেন, 'দেখো তো, ধারে কাছে শুকনো কাঠ পাওয়া যায় কিনা?'

'কিন্তু দেশলাই আছে তো সাথে?' জিজ্ঞেস করল হার্বার্ট।

'আছে,' উত্তর দিল পেনক্র্যাফট, 'জামার ভেতরের পকেটে রেখেছিলাম। সাগরের পানি ওটার নাগাল পায়নি।'

কিন্তু সমস্যা হলো শুকনো কাঠের। অনেক খুঁজেও কাঠ পেল না নেব। এমন কি ঘাস পাতাও না। ফিরে এসে বলল, 'নাহ্! কাঠ তো কাঠ, একটা কুটোও নেই কোথাও।'

'পাথর ছাড়া বোধ হয় আর কিছু নেই এদেশে,' বললেন স্পিলেট।

অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে এগোল ওরা। হঠাৎ সামনে একটা আওয়াজ শুনেই থমকে দাঁড়াল। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ। আর এগোনো চলবে না।

মনিবের নাম ধরে বার কয়েক চেঁচিয়ে ডাকল নেব। কিন্তু বৃথা। উত্তর দিলেন না ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং। শুধু নেবের ডাক সামনে কোন কিছুর গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল।

'সামনে নদী, সাগর নয়,' বলল পেনক্র্যাফট, 'নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে এ প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হচ্ছে। খোলা সাগরে প্রতিধ্বনি হয় না।'

পেনক্র্যাফটের যুক্তিতে সায় দিলেন স্পিলেট। গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নদীর তীর ধরে ঘুরতে ঘুরতে বোঝা গেল এপারের পাথুরে দ্বীপটা খুব একটা বড় নয়। চারদিকে টিলার মত পাহাড়ে গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই কোন হিংস্র জানোয়ার আছে বলেও মনে হয় না। নিশ্চিন্ত হয়ে একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর বসল সবাই। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর নীরবতা ভাঙল পেনক্র্যাফট, 'ক্যাপ্টেনকে বোধ হয় আর ফিরে পাব না।'

কিন্তু সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন স্পিলেট। বললেন, 'ভাল করে খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ওঁকে। কোথায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, কে জানে।'

পেনক্র্যাফটের কথায় একটু মনক্ষুণ্ন হলো নেব। বার বার মৃত্যুর মুখ থেকে যিনি বেঁচে এসেছেন, পানিতে ডুবে মরার পাত্র তিনি নন। নিজের হাতে ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ স্পর্শ না করা পর্যন্ত কারও কথা বিশ্বাস করবে না সে। বাকি তিনজনের মধ্যে আলোচনা চলল, সকাল হলে কিভাবে ক্যাপ্টেনের খোঁজ করা যায়।

ভোর হলো। আগের রাতে যেদিক থেকে প্রতিধ্বনি শোনা গেছে সেদিকে চাইল সবাই। সত্যি, খরস্রোতা নদীর ওপারে ডাঙা দেখা যাচ্ছে। তন্ময় হয়ে ওদিকে চেয়ে আছেন স্পিলেট, এমন সময় ঝপাৎ করে একটা শব্দে চমকে উঠে ফিরে চাইলেন। দেখলেন, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে ওপারে চলে যাচ্ছে নেব।

'যাচ্ছ কোথায় তুমি, নেব?' চেঁচিয়ে উঠলেন স্পিলেট।

'ওপারে, সাঁতরে উঠে ওই দ্বীপেই হয়তো আশ্রয় নিয়েছেন ক্যাপ্টেন।' সাঁতার কাটতে কাটতেই জবাব দিল নেব।

স্পিলেটও পানিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আটকাল পেনক্র্যাফট, 'কি

করছেন, মি. স্পিলেট? নেবের মত সাঁতার জানেন না আপনি। এই ভয়ঙ্কর খরস্রোতা নদীতে সাঁতরাতে গিয়ে জান হারাবেন নাকি? একটু অপেক্ষা করুন। ভাটার সময় নদীর পানি কমে গেলে আমরা ওপারে যাব।'

কিছুক্ষণেই ওপারে পৌঁছে গেল নেব। এপারের লোকদের উদ্দেশে একবার হাত নেড়ে লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। নিগ্রো ভৃত্যের প্রভুভক্তি অন্তর দুলিয়ে দিল সবার।

স্থির দৃষ্টিতে ওদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন স্পিলেট। তন্ন তন্ন করে আবার খোঁজা শুরু হলো এপারের দ্বীপটায়। কয়েক ঘণ্টা গরু খোঁজা করেও পাওয়া গেল না ক্যাপ্টেনকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে গেছেন তিনজনই। নদীর পানি কমতে শুরু করেছে তখন। এ হারে কমলে বিকেল নাগাদ একেবারে কমে যাবে পানি। তখন ওপারে গিয়ে দেখা যাবে খাবার কিছু পাওয়া যায় কিনা। কাল থেকে পেটে কিচ্ছু পড়েনি। বেলুনে করে প্রচুর খাবার আনা হলেও প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে সব ফেলে দিতে হয়েছে সাগরের পানিতে।

চার

বিকেল নাগাদ নদীর জল কমে গিয়ে হাঁটু পানিতে এসে ঠেকল। সকালের ভয়ঙ্কর খরস্রোতা নদীটাকে খালই বলা চলে এখন। হেঁটেই নদী পার হয়ে গেল অভিযাত্রীরা। ওপরে উঠেই নেব যে পথে গিয়েছিল সে পথে রওনা দিলেন স্পিলেট। যাবার আগে বলে গেলেন, 'নেবের খোঁজে যাচ্ছি আমি। খাবার, আর রাতে মাথা গোঁজার একটা জায়গা ঠিক করে রেখো।'

স্পিলেট চলে যেতেই হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফটও হাঁটতে শুরু করল। একটু পর খুদে গ্র্যানাইট পাহাড়গুলোর পাশ কাটিয়ে এসে দাঁড়াল একটা অপেক্ষাকৃত বড় পাহাড়ের পাদদেশে। পেনক্র্যাফট বলল, 'খাবার খোঁজার আগে চারপাশটা একবার দেখে নেয়া দরকার। নইলে হয়তো নিজেরাই কারও খাবার হয়ে যাব। চলো, পাহাড়ে উঠি।'

পাহাড়ে উঠতে গিয়ে বহু পাখি দেখল দু'জনে। ওরা কাছ দিয়ে যেতেও উড়ে পালাল না পাখিগুলো। মানুষকে ভয় পাচ্ছে না ওরা। তার মানে কখনও মানুষ দেখেনি। তাহলে পাখি দিয়েই রাতের আহারটা সারা যাবে, ভাবল পেনক্র্যাফট। কিন্তু ধরবে কি করে ওগুলোকে? খালি হাতেই একবার চেষ্টা করে দেখল পেনক্র্যাফট। কিন্তু আগে মানুষ না দেখে থাকলেও বোকা নয় পাখিগুলো, পেনক্র্যাফট ধরার চেষ্টা করতেই উড়ে পালাল ওরা। আরও কিছুটা উপরে উঠতেই দূরে গাছের সারি দেখা গেল। মনটা খুশি হয়ে উঠল হার্বার্টের। গাছপালা আছে যখন দ্বীপে, খাবারও নিশ্চয়ই আছে। তাহলে না খেয়ে মরতে হচ্ছে না আর।

পাহাড় বেয়ে নামার সময় চোখে পড়ল মস্ত গুহাটা, চিমনির মত গড়ন বলে ওরা গুহাটার নাম দিল—চিমনি গুহা। রাত কাটানোর উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গিয়ে খুশি হয়ে উঠল দু'জনে। সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই আর। গুহাটা একবার দেখে নিয়ে খাবার যোগাড়ে বেরোবে ভেবে গুহার ভেতরে ঢুকল ওরা। খাবারের জন্য বেরোতে হলো না আর। গুহার ভেতরেই পাওয়া গেল অনেকগুলো সাগরের ঝিনুক। পেনক্র্যাফট নাবিক। দেখেই বুঝল জোয়ারের সময় সাগরের পানি

গুহাতেও এসে ঢোকে।

ঝিনুকগুলোর দিকে আর একবার চাইল পেনক্র্যাফট। এই ঝিনুক আগুনে ঝলসে নিলে খেতে দারুণ লাগবে। এবার চাই খাবার পানি। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে পানির খোঁজে নিচে নামতে গিয়ে আরও খাবার পেয়ে গেল পেনক্র্যাফট। পাখির ডিম। পাহাড়ের খাঁজে বাসা বানিয়ে ডিম পেড়েছে পাহাড়ী পায়রা। খুশির ঠেলায় ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বলল হার্বার্ট, 'তোফা! তোফা! এ যে একেবারে শাহী আয়োজন হয়ে গেল দেখছি!'

কিন্তু পেনক্র্যাফট ভাবছে অন্য কথা। পানি। খাবার পানি কোথায়? পানি ছাড়া তো বাঁচা যাবে না।

নিচে নামতে নামতে দেখল, ওদিকের পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে আসছে দু'জন লোক। নেব আর স্পিলেট।

পাঁচ

ওদের দেখেই চেঁচিয়ে বললেন স্পিলেট, 'ক্যাপ্টেনকে পাওয়া গেল না। অনেক খুঁজলাম, কিন্তু ক্যাপ্টেনের পায়ের ছাপ পর্যন্ত চোখে পড়ল না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'খাবার—খাবারের জোগাড় করেছ?'

'তা করেছি,' জবাব দিল পেনক্র্যাফট, 'কিন্তু পানি? পানির কি হবে?'

'তার জন্যে ভাবনা নেই। একটা মিষ্টি পানির হ্রদ পেয়ে গেছি আমরা, আমি আর নেব প্রাণ ভরে পানি খেয়ে এসেছি, দুটো রুমাল ভিজিয়ে এনেছি তোমাদের জন্যে। এগুলো নিংড়েই আপাতত সেরে নাও কাজটা।'

শুকনো কাঠ জোগাড় করে গুহায় এসে ঢুকল ওরা। খেতে পাবে সেই আশায় উৎফুল্ল অভিযাত্রীরা। চিন্তিত কেবল পেনক্র্যাফট। ওর দেশলাইয়ের বাক্সটি হারিয়ে গেছে। ওর কথা শুনে মুচকি হাসলেন স্পিলেট। পকেটে হাত দিয়ে শেষ সম্বল একটা মাত্র কাঠি বের করে দিলেন নাবিকের হাতে। এটা পেয়ে দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল পেনক্র্যাফটের। যদি অন্য কিছুতে আগুন ধরাবার আগেই কাঠিটা নিভে যায়?

স্পিলেটের নোট বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে পাকিয়ে নিল পেনক্র্যাফট। তারপর একটা শুকনো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ওতে ঘষল দেশলাইয়ের কাঠিটা। জ্বলল না। ভয়ে ভয়ে হার্বার্টকে ডাকল সে। ভয় পেয়েছে হার্বার্টও, তবে ঘষে ঘষে শেষ পর্যন্ত হার্বার্টই কাঠিটা জ্বালল। প্রথমে পাকানো কাগজটায় আগুন ধরিয়ে দিল শুকনো ঘাস-পাতা এক জায়গায় জড়ো করে ওতে আস্তে করে রাখল জ্বলন্ত কাগজ। দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল ঘাস-পাতায়। এবার একটা একটা করে শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে বড়সড় আগুনের কুণ্ড বানিয়ে ফেলা হলো। চুকল খাওয়া-দাওয়ার পাট।

ধীরে ধীরে রাত নামল অজানা জায়গায়। সেই সাথে কনকনে শীত। আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে একথা ওকথা আলোচনা করতে লাগল সবাই। কথা বলল না শুধু নেব। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে সে। ভাবছে মনিবের কথা।

ছয়

বেলুন থেকে নামার পর কি কি জিনিস আছে তার একটা হিসেব তৈরি করতে বসল সবাই মিলে। পরনের জামা-কাপড় ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই কারও। গিডিয়ন স্পিলেটের নোট বই আর ঘড়িটা ছাড়া সব ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে বেলুন থেকে। এক কথায় ব্যবহার করার মত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিছুই নেই ওদের কাছে।

থাকার জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। আর আগুন যখন জ্বলছে তা জিইয়ে রাখার ব্যবস্থাও করা যাবে। পাহাড়ের খাঁজে আছে পায়রা আর তার ডিম। পানির ধারে ঝিনুক। খুঁজলে জঙ্গলে ফলমূলও পাওয়া যেতে পারে। মিষ্টি পানির হ্রদও আছে। কাজেই প্রাণ ধারণের ব্যাপারে খুব একটা চিন্তা নেই এই মুহূর্তে।

ঠিক হলো, ঘুরে দেখবে ওরা আশ-পাশের পাহাড়, জঙ্গল, দ্বীপ। পায়রার ডিম আর ঝিনুক দিয়ে নাস্তা হলো সেদিন। পাহাড়ের খাঁজ থেকে খানিকটা নুন জোগাড় করে এনেছিল হার্বার্ট। কাজেই জমল খাওয়াটা। এবার আগুনটাকে জিইয়ে রাখার বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই অভিযানে বেরোনো যায়।

পকেট থেকে চেক কাটা বড় রুমালটা বের করল পেনক্র্যাফট। তারপর শক্ত করে ওটাকে পাকিয়ে নিয়ে এক মাথায় আগুন ধরাল। আগুন ধরে উঠলে ফুঁ দিতেই শিখা নিভে গিয়ে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকল রুমালের আগুন। বহুক্ষণ লাগবে পুরো রুমালটা পুড়ে শেষ হতে। পানি আর হাওয়ার হাত থেকে ওটাকে রক্ষা করার জন্যে চিমনির ভেতরের একটা কোটরে রুমালটা লুকিয়ে রাখল পেনক্র্যাফট। গুহা থেকে বেরিয়ে হার্বার্টকে নিয়ে প্রথমেই জঙ্গলে ঢুকল পেনক্র্যাফট। গাছের একটা ডাল ভেঙে চলনসই একটা গদা বানিয়ে নিল সে। ছুরি নেই, কাজেই পাথরে ঘষে ডালটার একটা মাথা কিছুটা চোখা করে নিল।

জঙ্গলে মানুষ বাসের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। তবে চতুষ্পদ জানোয়ারের পায়ের দাগ আছে। চুপচাপ এগিয়ে চলল দু'জনে। একঘণ্টা হেঁটেও মাইল খানেক পথ অতিক্রম করতে পারল না। খাওয়ার মত ফলমূল চোখে পড়ছে না, এমন কি একটা নারকেল গাছও নেই। এ কেমনতর জায়গা! এক জায়গায় অনেকগুলো বুনো পাখির দেখা পাওয়া গেল। ছোটো আকারের এই পাখিগুলোর পালকের রঙ বিচিত্র। লম্বা লেজ ঝুলিয়ে এডালে ওডালে নেচে বেড়াচ্ছে। ঘাস থেকে একটা পালক কুড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করে বলল হার্বার্ট, 'মনে হচ্ছে এগুলো করোকাস জাতীয় পাখি।'

'খেতে ভাল তো?' জানতে চাইল পেনক্র্যাফট।

'ভাল মানে! এক্কেবারে বন মোরগের মত।'

পা টিপে টিপে একটা নিচু ডালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। পোকা খাওয়ার জন্যে ডালটাতে এসে জমেছে পাখিগুলো। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কাস্তে দিয়ে কোপ মারার মত করে গদা চালাল পেনক্র্যাফট। নিরীহ পাখিগুলো পালানোর চেষ্টাও করল না। টপাটপ পড়ল একটার পর একটা। পাখিগুলোকে একটার সাথে আর একটা বেঁধে মালার মত করে গলায় ঝুলিয়ে নিল দু'জনে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল। টপ থাকলে হয়তো ঘাসের ভেতর তাড়া করে খরগোস ধরে ফেলতে পারত এক আধটা। দুপুরের একটু পরে একজায়গায় নতুন ধরনের অনেকগুলো

পাখি দেখা গেল। কর্কশ, তীক্ষ্ণ ওদের গলার স্বর। পাখিগুলোর ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠছে বনভূমি। ধরতে গিয়েই টের পেল পেনক্র্যাফট, হার্বার্টের বনমোরগের মত বোকা নয় পাখিগুলো। সহজে হবে না দেখে অন্য ফন্দি বের করল সে।

সরু লতা একটার মাথায় আর একটা বেঁধে দশ-বারো ফুট লম্বা করে নিল। লতার এক মাথায় বাবলার কাঁটা বাঁকিয়ে বাঁধল শক্ত করে। মাটি থেকে লাল কেঁচো তুলে গেঁথে দিল কাঁটায়। গোটা ছয়েক পাখির বাসায় রেখে এল এ ধরনের হাতে বানানো বড়শি। নিজেরা লুকিয়ে রইল ঝোপের আড়ালে। পাখিগুলো উড়ে এসে বাসায় বসতেই লতার অন্য মাথা ধরে আস্তে করে ঝাঁকুনি দিল পেনক্র্যাফট। কেঁচোগুলো কিলবিলিয়ে উঠতেই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাখির দল। হ্যাঁচকা টান মারল পেনক্র্যাফট। ব্যস। বড়শিতে মাছ গাঁথার মত কাঁটা আটকে গেল পাখির ঠোঁটে।

ডাঙায় বড়শি ফেলে পাখি শিকার! আশ্চর্য ব্যাপার! মজা পেয়ে শিশুর মত হাততালি দিয়ে লাফাতে লাগল হার্বার্ট। এই অদ্ভুত বুদ্ধি বের করায় পেনক্র্যাফটের তারিফ করতে লাগল সে।

'ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়,' বলল পেনক্র্যাফট, 'বহু যুগ ধরেই কায়দাটা জানে নাবিকরা।'

গুহায় এসে ঢুকল ওরা। গরম গরম ঝিনুক পোড়া, ডিমের অমলেট আর পাখির কাবাব খেয়ে আরামের ঢেকুর তুলল। তারপর গোল হয়ে অগ্নিকুণ্ডের ধার ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। দারুণ পরিশ্রম গেছে সারাটা দিন। শুতে না শুতেই ঘুম এসে গেল চোখের পাতায়।

কিন্তু ওদের সাথে যোগ দিল না নেব। কিছু খেলও না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মনিবকে না পেয়ে খুবই মুষড়ে পড়েছে বেচারা।

সাত

সকাল থেকে কোথাও পাওয়া গেল না নেবকে। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেল তিনজনে, কিন্তু কোন হদিস করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ভাবল ওরা কোথাও গেছে নেব, সময় হলেই ফিরবে। কিন্তু ফিরল না নেব। সারাদিন অপেক্ষা করেও যখন নেবকে ফিরতে দেখল না ওরা, ধরেই নিল মনিবের খোঁজে গেছে নেব। ক্যাপ্টেনকে না পেলে আর ফিরবে কিনা তাই বা কে জানে!

বিকেলের দিকে উঠল তুমুল ঝড়। একে দারুণ শীত, তার ওপর তুফান। গুহা থেকে আর বেরোতে পারল না কেউ। শীতে কাঁপতে কাঁপতে কুঁজো হয়ে আগুনের পাশে বসে রইল অভিযাত্রীরা। ঝড়ের দাপটে খেপে গেছে তীব্র খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। কানে আসছে বাইরে পাহাড়ের গায়ে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ। রাতটা কি করে কাটবে কে জানে! একটানা ঝড়ের গর্জন শুনতে শুনতে একটু তন্দ্রা মত এসেছিল অভিযাত্রীদের।

হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল স্পিলেটের। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে তখন। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করলেন তিনি। ঝড়ের প্রলয়ঙ্করী আওয়াজের মাঝে একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে। কনুই দিয়ে গুঁতো মারলেন তিনি পেনক্র্যাফটের পাঁজরে। ধড়মড় করে উঠে বসল পেনক্র্যাফট।

'কিছু শুনেছ, পেনক্র্যাফট?'

হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসায় প্রথমে কিছুই শুনতে পেল না পেনক্র্যাফট।

একটু পর সামলে নিয়ে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। তারপর হেসে বলল, 'স্বপ্ন দেখছেন নাকি? তুফানের আওয়াজ ছাড়া কিছুই তো শোনা যাচ্ছে না।'

'ভাল করে শোনো, পেনক্র্যাফট।'

আর একটু শুনেই লাফিয়ে উঠল সে, 'আরে তাইতো! কুত্তা ডাকছে না?'

'কুত্তাই,' সায় দিল হার্বার্ট। ওদের কথাবার্তায় ঘুম ভেঙে গেছে ওরও।

এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ। এখানে কুকুর! তবে কি জঙ্গলে অসভ্যদের বাস আছে? কুকুর নিয়ে শিকারে বেরিয়েছে ওরা? কিন্তু এ দুর্যোগের রাতে কেন? গুঁড়ি মেরে গুহার মুখে এগিয়ে গেল ওরা। ডাকটা থেমে থেমে একবার এদিক একবার ওদিক থেকে আসছে। তাহলে কি দু'দিক থেকেই আসছে শিকারীর দল? ক্রমশ গুহার দিকেই এগিয়ে আসছে কুকুরের ডাক। আরও কাছে আসতেই বললেন স্পিলেট, 'টপের ডাক না তো?'

সাথে সাথেই এক লাফে গিয়ে একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো নিয়ে এল হার্বার্ট। স্পিলেট বাধা দেবার আগেই একছুটে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল সে। কাঠটা মশালের মত ধরে নাড়াতে নাড়াতে চেঁচিয়ে ডাকল, 'টপ। টপ, এদিকে, এদিকে এসো।'

এই ডাকের জন্যেই যেন তৈরি হয়ে ছিল কুকুরটা। একছুটে হার্বার্টের কাছে এসে দাঁড়াল। টপই।

'কিন্তু দু'দিক থেকে যে কুত্তা ডাকছিল!' বলল পেনক্র্যাফট।

'টপই এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করে আমাদের খুঁজছিল।' মন্তব্য করলেন স্পিলেট।

ঘেউ ঘেউ করে একটানা ডেকে চলেছে আর লেজ নাড়ছে টপ। যেন বলতে চাইছে কিছু। এসময়ে একটা অদ্ভুত জিনিস নজরে পড়ল সবার। ভীষণ ঝড় তুফানের ভেতর দিয়ে এসেছে টপ, কিন্তু গায়ে কাদামাটি লাগেনি একটুও। তেমন একটা পরিশ্রান্তও হয়নি সে। আশ্চর্য!

এ কোন্ রহস্যের শুরু! কিন্তু এ নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাল না কেউ। স্পিলেট বললেন, 'মনে হচ্ছে, টপ কিছু বলতে চাইছে আমাদের।'

'আমাদের কোথাও নিয়ে যেতে চায় ও। দেখছেন না কেমন ছটফট করছে?' বলল হার্বার্ট।

'হয়তো ওর মনিবের কাছেই নিয়ে যেতে চাইছে আমাদের,' বললেন স্পিলেট।

সাথে সাথেই তৈরি হয়ে নিল সবাই। আগুনে কয়েকটা শুকনো কাঠ ছুঁড়ে দিল পেনক্র্যাফট। তারপর সাথে কিছু খাবার নিয়ে টপের পিছু পিছু রওনা দিল তিনজন। অন্ধকারে পরস্পরের হাত ধরে টপের ডাক অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে ওরা। পেছনে একনাগাড়ে ঝাপটা মেরে চলেছে শীতল ঝোড়ো হাওয়া।

কতক্ষণ এভাবে হেঁটেছে বলতে পারবে না ওরা। অনেক, অনেকক্ষণ পর অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করল। পুব দিগন্তে আলোর আভাস। টপকে দেখা যাচ্ছে এখন। একটা পাহাড়ে চড়ছে টপ। আরও অনেক চড়াই উৎরাই, বালি আর কাঁকরে ভরা পাহাড়ী পথ পেরিয়ে গেল টপ। সাথে সাথে অভিযাত্রীরাও। শেষ পর্যন্ত একটা গুহার কাছে এসে দাঁড়াল টপ। ঘুরে দাঁড়িয়ে একবার চাইল ওদের দিকে, তারপর ঢুকে গেল গুহার ভেতর। দেখাদেখি ঢুকে পড়ল তিন অভিযাত্রীও।

একটা ঘাসের বিছানার পাশে চুপচাপ বসে আছে নেব। বিছানায় পড়ে রয়েছে একটা অনড় দেহ। ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং।

আট

ওরা ঢুকতেও ফিরে চাইল না নেব। যেন শুনতেই পায়নি। ক্যাপ্টেনের দেহে প্রাণ আছে কিনা জানতে চাইল পেনক্র্যাফট। কিন্তু উত্তর দিল না নেব। তবে কি সত্যিই মারা গেছেন ক্যাপ্টেন?

অনুমানের ওপর কখনও ভরসা করেন না স্পিলেট। এগিয়ে গিয়ে উবু হয়ে বসলেন ক্যাপ্টেনের পাশে। নাড়ী দেখলেন, বুকে কান পেতে শুনলেন। তারপর আস্তে করে বললেন, 'বেঁচে আছেন। কিন্তু নাড়ীর গতি অত্যন্ত ক্ষীণ।'

একলাফে স্পিলেটের পাশে এসে বসল পেনক্র্যাফট। ক্যাপ্টেনের বুকে কান পেতে সেও শুনল হৃৎপিণ্ডের শব্দ। বেঁচেই আছেন ক্যাপ্টেন

গুহা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল হার্বার্ট। কোত্থেকে যেন রুমাল ভিজিয়ে আনল। ভিজে রুমাল দিয়ে ক্যাপ্টেনের শুকনো ঠোঁট মুছে দিলেন স্পিলেট। একটু পরই আস্তে করে নিঃশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন।

'ভয় নেই, নেব,' বললেন স্পিলেট। 'এ যাত্রা মরবেন না উনি।'

'বাঁচবেন?' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল নেব। 'বলুন, কি করলে জ্ঞান ফেরানো যাবে ওঁর, চাঙ্গা করা যাবে?'

'তাড়াহুড়ো করলে কাজ হবে না, নেব।'

হাতের তালু দিয়ে ঘষে ঘষে ক্যাপ্টেনের হাত-পায়ে তাপ দিতে শুরু করলেন স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট।

'ওঁকে খুঁজে পেলে কি করে?' নেবকে জিজ্ঞেস করল পেনক্র্যাফট।

বিষণ্ণ ভাবটা এখন চলে গেছে নেবের চেহারা থেকে। পেনক্র্যাফটের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'আপনারা ঘুমিয়ে পড়লে চিমনি গুহা থেকে পালিয়ে আসি আমি। ক্যাপ্টেনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকি। এ জায়গার কাছাকাছি এসেই টপের দেখা পেলাম। আমাকে দেখে খুশির ঠেলায় চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এসে আমার হাত চাটতে লাগল টপ। তারপর পায়জামার কাপড় কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে এল এখানে। ক্যাপ্টেনকে মড়ার মত পড়ে থাকতে দেখে ভেঙে পড়লাম। আমি তো ভেবেছিলাম মারাই গেছেন উনি। টপকে পাঠিয়েছিলাম আপনাদের ডেকে আনার জন্যে। ওর মত ট্রেনিং পাওয়া কুকুরের পক্ষে কাজটা কিছুই না।'

হঠাৎ আবার কথাটা মনে হলো স্পিলেটের। এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে এতটা পথ পেরিয়ে গিয়েও কাদাপানি লাগেনি কেন টপের গায়ে? আর ওরা যে চিমনি গুহায়ই আছে তা টপ জানল কি করে? হোক না সে ট্রেনিং প্রাপ্ত। ওঁর কাছে ভৌতিক মনে হলো ব্যাপারটা। কুসংস্কারাচ্ছন্ন নেব ভয় পাবে বলে চেপে গেলেন তিনি।

অনেকক্ষণ পর একটু নড়েচড়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। একটা হাত তোলার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। আরও কিছুক্ষণ ঘষাঘষির পর ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল ক্যাপ্টেনের। তাড়াতাড়ি ওঁর মুখে একটু পানি ঢেলে দিল পেনক্র্যাফট। সেই সাথে একটু মুরগীর স্যুপ। সেটুকু গিলে নিয়ে চোখ মেললেন ক্যাপ্টেন। বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করলেন, 'দ্বীপ, না মহাদেশ?'

'সে কথা পরে হবে।' বিস্মিত ভাবে বলল পেনক্র্যাফট, 'ভাল হয়ে নিন তো আগে।'

আর কোন কথা না বলে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন।

'এরকম লোক তো দেখিনি! মরতে মরতে বেঁচে উঠেছে, আর উঠেই জানতে চাইছে দ্বীপ না মহাদেশ!' বিড় বিড় করে বলল পেনক্র্যাফট।

ক্যাপ্টেন ঘুমিয়ে পড়লে হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফট গুহা থেকে বেরিয়ে এল। একটু দূরের গাছ থেকে কয়েকটা ডাল ভেঙে নিয়ে লম্বা ভাবে সাজাল। তার উপর আর কয়েকটা ডাল আড়াআড়ি ভাবে রেখে ঘাস-পাতা দিয়ে ঢেকে দিতেই স্ট্রেচারের মত হয়ে গেল। বয়ে নিয়ে যেতে হবে ক্যাপ্টেনকে।

গভীর ঘুমের পর দুপুরের দিকে উঠে বসলেন ক্যাপ্টেন। গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পেনক্র্যাফটের দেয়া পাখির গোশত খেলেন।

'তা ব্যাপারটা কি, ক্যাপ্টেন? পানিতেই পড়ে গেছিলেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল হার্বার্ট

'পানিতেই পড়েছিলাম। ঢেউয়ের ধাক্কায় হাত ফসকে যায় দড়িটা। পড়েই সাঁতরাতে শুরু করলাম। সাঁতরাতে সাঁতরাতেই টের পেলাম আমি একা নই, আমার সামনেও কেউ সাঁতরাচ্ছে। একটু পরেই চেঁচামেচি শুরু করল টপ আমাকে পড়ে যেতে দেখে সেও সাগরে লাফিয়ে পড়েছে।' একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন, 'কিন্তু কতক্ষণ আর ওই উত্তাল ঢেউয়ের সাথে লড়াই করা যায়? হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে। তারপরই জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান হলে দেখি আমার জামা-কাপড় কামড়ে ধরে টানাটানি করছে টপ। আবার সাঁতরাতে চেষ্টা করতেই পায়ের নিচে মাটি ঠেকল। টলতে টলতে ডাঙায় উঠে দ্বিতীয়বার জ্ঞান হারালাম। আর কিছুই মনে নেই।'

'আশ্চর্য!' চোখ কপালে তুলল পেনক্র্যাফট, 'তীরে উঠেই জ্ঞান হারালেন? তাহলে তীর থেকে মাইলখানেক দূরের এই গুহায় এলেন কি করে? টপ নিশ্চয়ই বয়ে আনেনি। ওর পক্ষে সেটা সম্ভবও না।'

'তাই নাকি?' নিজেও আশ্চর্য হলেন ক্যাপ্টেন, 'আমি ভেবেছিলাম তোমরাই আমাকে এ গুহায় বয়ে এনেছ। সত্যিই আশ্চর্য! আমি নিজে হেঁটে আসিনি একথা ঠিক। তাহলে? এ উপকারটুকু কে করল? আমরা ছাড়া আর কেউ আছে এই দ্বীপে?'

'এখনও দেখিনি কাউকে,' বলল স্পিলেট, 'তবে আছে বলে মনে হয় না। পাখিগুলো মানুষকে ভয় পায় না, কারণ এর আগে মানুষ দেখেনি।'

হঠাৎ কি কারণে যেন উত্তেজিত মনে হলো ক্যাপ্টেনকে। বললেন, 'পেনক্র্যাফট, গুহার বাইরে পায়ের ছাপ নিশ্চয়ই আছে। কারণ তোমরা ঢুকেছ, বেরিয়েছ। দেখো তো, এ ছাড়া কোন পায়ের ছাপ আছে কিনা, যার সাথে আমার জুতোর ছাপ মিলে যায়।'

পাওয়া গেল। অনেকগুলো ছাপের সাথে মিলে গেল ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর জুতোর ছাপ। তার মানে পানি থেকে উঠে এখান পর্যন্ত হেঁটেই এসেছেন ক্যাপ্টেন।

পেনক্র্যাফট এসে কথাটা জানাতেই ক্যাপ্টেন বললেন, 'তাহলে ঘুমের ঘোরে টহল দেয়ার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সেই প্রবাদটা সত্যিই। ঘোরের মাঝে হেঁটেছি আমি, পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে টপ। টপ, আয়তো এদিকে।'

একলাফে মনিবের কাছে এসে দাঁড়াল প্রভুভক্ত কুকুর। ওর পিঠটা চাপড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

কিন্তু সন্দেহ থেকে গেল স্পিলেটের মনে। হতচ্ছাড়া এই জায়গার এ আরেক রহস্য নয়তো?

আর দেরি করার কোন মানে হয় না। চিমনি গুহায় ফিরে যাওয়া উচিত। বাইরে থেকে ঘাস-পাতার গদিওয়ালা স্ট্রেচারটা নিয়ে আসা হলো। ধরাধরি করে তার ওপর শুইয়ে দেয়া হলো ক্যাপ্টেনকে। পেনক্র্যাফট আর নেব স্ট্রেচারটা কাঁধে তুলে নিতেই রওনা দিল সবাই। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে চিমনি গুহায় পৌঁছুল ওরা। বালির ওপর নামিয়ে রাখা হলো স্ট্রেচার। তখনও ঘুমাচ্ছেন ক্যাপ্টেন।

চিমনি গুহার কাছে এসে অবাক হয়ে গেল সবাই। চেনাই যাচ্ছে না আর এলাকাটাকে। ঝড়ের দাপটে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছে বিশাল সব পাথর। অনেকগুলো আবার সাগরের তীর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। গুহার মুখে পড়ে থাকা কয়েকটা পাথরের গায়ে সামুদ্রিক গুল্ম লেগে আছে। এখানে ওই গুল্ম এল কোত্থেকে? তবে কি সাগরের ঢেউ এখান পর্যন্ত এসেছে? সবাই বিস্মিত হয়ে ভাবছে, হঠাৎ কি মনে হতেই একছুটে গুহায় গিয়ে ঢুকল পেনক্র্যাফট। ঢুকেই চক্ষু স্থির। ঝড়ে ফুঁসে উঠা সাগরের উত্তাল তরঙ্গ গুহায় ঢুকে তছনছ করে দিয়ে গেছে গুহাটাকে। যেখানে অগ্নিকুণ্ডটা ছিল সেখানে থিক থিক করছে কাদা। পাগলের মত গিয়ে আগুন লাগানো রুমালটার জন্যে কোটরে হাত দিল সে। পানি লাগল হাতে। রুমালটা নেই। তাহলে এখান পর্যন্ত উঠেছিল ঢেউ! আর এই ঢেউই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ওদের আগুন জ্বালাবার শেষ সম্বলটুকুও।

নয়

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পেনক্র্যাফট। কিন্তু আগুন নিভে যাওয়ায় আর কেউ ততটা মাথা ঘামাল না। হার্বার্ট অবশ্য একটু ঘাবড়ে গেল। সান্ত্বনার সুরে স্পিলেট বললেন, 'অত ভাবনার কি আছে, পেনক্র্যাফট? ক্যাপ্টেন যখন বেঁচে আছেন আগুনের অভাব হবে না।'

'হবে না? তা, আগুনটা আসবে কোত্থেকে?'

'জানি না, তবে আগুন জ্বলবে।'

চুপ করে গেল পেনক্র্যাফট। ভাবল, আর সবাই যখন এ নিয়ে ভাবছে না তখন ও একা ভেবে আর কি লাভ?

গুহার ভেতর একটা অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গায় সামুদ্রিক গুল্ম আর ঘাস পাতা বিছিয়ে বিছানা তৈরি করে তাতে শোয়ানো হলো ঘুমন্ত ক্যাপ্টেনকে। ঘুম এখন তাঁর দরকার।

রাত নামতেই শীতের প্রকোপও বাড়ল। নিজেদের কোট, ওভারকোট গা থেকে খুলে নিয়ে ক্যাপ্টেনকে ঢেকে দিল অভিযাত্রীরা। ঝড়ের ধাক্কায় চিমনি গুহার গা থেকে অনেকগুলো পাথর খুলে পড়ে গিয়ে ফোঁকরের মত হয়ে গেছে। হু হু করে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে সে সব ফোঁকর দিয়ে। শুকনো শ্যাওলা জড়ো করে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করল পেনক্র্যাফট। কাজ হলো না। কাঠে কাঠ ঘষে নাকি আগুন জ্বালায় কোন কোন দেশের অসভ্য লোকেরা। কাজেই নেব আর পেনক্র্যাফট দুটো করে কাঠ নিয়ে ঘষতে শুরু করল। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও দর দর করে ঘামতে লাগল দু'জন কিন্তু আগুন জ্বলল না। খানিক চেষ্টার পর বিরক্ত হয়ে দু'জনেই ছুঁড়ে ফেলে দিল কাঠের টুকরো।

জংলীরা কাঠে কাঠ ঘষে আগুণ জ্বালে ঠিকই, কিন্তু তারা জানে কোন্ কাঠে ঘষতে হয় কোন্ কাঠ। সব কাঠ ঘষলেই আগুন জ্বলে না। ফেলে দেয়া দুটো

কাঠের টুকরো নিয়ে এবার ঘষতে শুরু করল হার্বার্ট। শব্দ করে হেসে ফেলল পেনক্র্যাফট। হার্বার্টও হাসল। বলল, 'আগুন জ্বালাবার জন্যে ঘষছি না আমি, পেনক্র্যাফট। এভাবে পরিশ্রম করলে আর কিছু না হোক গা তো গরম হবে।'

আরও গভীর হলো রাত। চুপচাপ ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন স্পিলেট। এবার লম্বা করে হাই তুলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন বালির ওপর। একটু পর বাকি তিনজনও শুয়ে পড়ল। গুহার মুখের কাছে শুয়ে পাহারা দিতে থাকল টপ।

পরদিন সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল ক্যাপ্টেনের। সঙ্গীরা তাঁকে ঘিরে বসে আছে। চোখ খুলে আগের দিনের মতই জানতে চাইলেন তিনি, 'দ্বীপ, না মহাদেশ?'

'এখনও জানি না, ক্যাপ্টেন।' উত্তর দিল পেনক্র্যাফট।

'জানো না?'

'আপনি সেরে উঠলেই জানা যাবে।'

'তাহলে সেরে গেছি আমি।' একটু চেষ্টায়ই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। 'বেশ কাহিল লাগছে। খাবার-টাবার আছে কিছু?'

'খাবার আছে, তবে আগুনের কোন ব্যবস্থা নেই।' বলল পেনক্র্যাফট।

সব শুনে বললেন ক্যাপ্টেন, 'চিন্তার কিছু নেই, দেশলাই বানিয়ে নেব।'

'দেশলাই বানাবেন?'

'হ্যাঁ, দেশলাই।'

'কি, বলেছিলাম না?' নাবিকের পিঠ চাপড়ে আশ্বাস দিলেন সাংবাদিক।

কিছু সামুদ্রিক গুল্ম আর ঝিনুকের শাঁস খেতে দেয়া হলো ক্যাপ্টেনকে। কয়েকমুহূর্ত খাবারের দিকে চেয়ে থেকে পানি দিয়ে ওগুলোকে গিলে ফেললেন ক্যাপ্টেন। তারপর সবাইকে নিয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলেন। একটা পাথরের ওপর আয়েশ করে বসে সবার উদ্দেশে বললেন, 'তাহলে আমরা এখন কোথায় আছি তাই জানা নেই। কোন দ্বীপে না মহাদেশে তাও না?'

'না,' বলল হার্বার্ট।

'সেটা কালই জেনে নেব। তার আগে আমাদের করবার কিছু নেই?'

'আছে,' বলল পেনক্র্যাফট।

'কি?'

'আগুন।'

'তা হবে, পেনক্র্যাফট। কাল আসার সময় পশ্চিমে একটা মস্ত পাহাড় দেখেছি। ওই পাহাড়ে চড়েই দেখতে হবে এটা দ্বীপ না মহাদেশ। তার আগে দেখছি হাত গুটিয়েই বসে থাকতে হবে।'

'বসে থাকবেন কেন? আগুন জ্বালবেন না?'

'সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, পেনক্র্যাফট, আগুন তুমি পাবে,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'বন্ধুরা,আমাদের অবস্থা কিন্তু খুব ভাল ঠেকছে না। যদি এটা মহাদেশ হয়, তাহলে চিন্তা নেই। লোকালয় পাবই। কিন্তু যদি দ্বীপ হয়, আর জাহাজ চলাচলের বাইরে থাকে এ দ্বীপ, তাহলেই হয়েছে। বাকি জীবনটা এখানে কাটানো ছাড়া উপায় নেই। কাজেই সে জন্যে আমাদের তৈরি হওয়া দরকার। পেনক্র্যাফট, কিছু শিকারের প্রয়োজন। পাহাড়ে চড়তে হলে আগে গোশত খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিতে হবে।'

'কিন্তু আগুন? কাঁচা গোশত খাই কি করে?'

'আমার ওপর ভরসা করতে পারছ না, পেনক্র্যাফট? বললাম তো, শিকার নিয়ে এসে দেখবে আগুন জ্বলে গেছে।'

'পেনক্র্যাফট,' এবার কথা বললেন স্পিলেট, 'বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছুই নেই। আর ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং বলতে গেলে একটা চলন্ত বিজ্ঞান।'

কিন্তু তবুও সন্দেহ গেল না পেনক্র্যাফটের। নেবও ওর কানে কানে বলল, 'খামোকা সময় নষ্ট করছ, নাবিক। ক্যাপ্টেন যখন বলেছেন, ধরে নাও আগুন জ্বলে গেছে।'

আমতা আমতা করে শেষ পর্যন্ত বেরিয়েই পড়ল পেনক্র্যাফট। নেব আর হার্বার্টও সঙ্গ নিল। পেছন পেছন এল টপ। অনেক কায়দা কৌশল আর পরিশ্রম করে একটা ক্যাপিবারার (এক জাতের শুয়োর) সন্ধান মিলল। কান কামড়ে ধরে ঝোপের ভেতর থেকে শুয়োরটাকে টেনে হিচড়ে বের করে আনল টপ। জোরাজুরি করতে গিয়ে একটা কানই ছিঁড়ে গেল ওটার। লাফ দিয়ে গিয়ে কর্দমাক্ত পুকুরে পড়ল আড়াই ফুট লম্বা বাদামী জানোয়ারটা। ব্যস! গাছের ডালের তৈরি গদা দিয়ে ওটাকে দমাদম পেটাতে শুরু করল তিন অভিযাত্রী। অল্পক্ষণেই মারা গেল শুয়োরটা। শিকার কাঁধে ফিরে চলল ওরা চিমনি গুহায়। বনের মাঝ দিয়ে চলার সময় এক জাতের বাদামের দেখা পেল হার্বার্ট। চমৎকার চাটনী হয় বাদামগুলোর। কিন্তু শুষ্ককণ্ঠে বলল পেনক্র্যাফট, 'কি হবে চাটনী দিয়ে? কাঁচা গোশতের সাথে চাটনী থাকা না থাকা সমান কথা।'

'আমি বলছি তোমাকে, নাবিক,' জোর দিয়ে বলল নেব, 'কাবাবের সাথেই চাটনী খাব আমরা।'

চিমনি গুহা তখনও বেশ দূরে। ওদিকে চেয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল পেনক্র্যাফট। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না সে। চিমনি গুহার ভেতর থেকে ভলকে ভলকে আকাশে উঠে যাচ্ছে কালো ধোঁয়া।

দশ

ধোঁয়া! মানে আগুন!

চোখ কপালে তুলে বলল পেনক্র্যাফট, 'সেরেছে! যাদু জানেন নাকি ক্যাপ্টেন? যাদুকর?'

স্তম্ভিত হয়ে গেছে পেনক্র্যাফট। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অজানা দ্বীপে, আগুন জ্বালাবার কোন ব্যবস্থাই যেখানে নেই, সেখানে আগুন জ্বালালেন ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং। লোকটা প্রেতসিদ্ধ নয়তো? ভাবতে ভাবতে পথ চলছে নাবিক পেনক্র্যাফট।

গুহায় ঢুকে ওর সন্দেহের কথাটা ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেসই করে ফেলল পেনক্র্যাফট। কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠে বললেন ক্যাপ্টেন, 'না, পেনক্র্যাফট, না। ম্যাজিকের ম-ও জানি না আমি। তবে কিছু বিজ্ঞানের কৌশল জানা আছে আমার। ঠেকায় পড়লে তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে নিই।'

'আগুনটা এল কোত্থেকে তাহলে? মাটি ফুঁড়ে?'

'মাটি ফুঁড়ে না এলেও আকাশ ফুঁড়ে তো বটেই।'

'মানে?'

'বার্নিং গ্লাস আছে আপনার, তাই না ক্যাপ্টেন?' কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করে বসল হার্বার্ট।

'ওসব কিছু নেই।' উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন, 'আমার ঘড়ি আছে, মি.

স্পিলেটেরও আছে। ঘড়ির কাঁচ দুটো খুলে নিয়ে কিনারায় কিনারায় মিলিয়ে একটু ফাঁক রেখে বাকিটা কাদা দিয়ে জুড়ে দিলাম সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরটায় পানি ভরে ফাঁকটাও বন্ধ করে দিলাম। কি দাঁড়াল জিনিসটা?'

বোকার মত ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে রইল পেনক্র্যাফট।

'কনভেক্স লেন্স।' উত্তরটা বলে দিলেন ক্যাপ্টেনই. 'এ লেন্সের মাঝখান দিয়ে প্রবেশ করা কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মির তাপমাত্রা বেড়ে যায় বহুগুণে। এই কেন্দ্রীভূত রশ্মি শুকনো ঘাস পাতার ওপর ফেললে তা দপ করে জ্বলে ওঠে।'

ব্যস। এর বেশি আর বোঝার দরকার নেই পেনক্র্যাফটের। কাবাব করার আগুন পেয়েছে এতেই সন্তুষ্ট। সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে গেল সে।

আগুনের আঁচ থাকাতে আর শীত লাগছে না চিমনি-গুহার ভেতর। পাথর সরে যাওয়া ফোঁকরগুলোও কাঠ আর কাদা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন স্পিলেট আর হার্ডিং

পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেলেন ক্যাপ্টেন। চূড়ায় উঠে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন দূরের বড় পাহাড়টার দিকে। ওই পাহাড়েই উঠতে হবে আগামীকাল। এখান থেকে উত্তর পশ্চিমের ওই পাহাড়টার দূরত্ব মাইল ছয়েক। উচ্চতা সাড়ে তিন হাজার ফুটের মত হবে আন্দাজ করলেন তিনি। তাহলে. ওটার চূড়া থেকে চারদিকের পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত দেখা যাবেই। ওইটুকু দেখা গেলেই কাজ চলে যাবে তাঁর।

চমৎকার হলো রাতের খাওয়াটা শুয়োরের মাংসের কাবাব. পাখির আস্ত রোস্ট আর বাদামের চাটনী। খাওয়ার পর আয়েশ করে ঢেকুর তুলে আগুনের পাশে গোল হয়ে বসল সবাই। গল্প করতে করতেই একসময় হাই তুলতে শুরু করল ওরা। শেষে আগুনের ওপর আরও কিছু কাঠ ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল শুল্ম আর ঘাস-পাতার বিছানায়।

পরদিন ঝরঝরে শরীর নিয়ে ঘুম থেকে উঠল অভিযাত্রীরা। বেলা দশটায় গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল সবাই। জঙ্গলের কাছে গিয়ে পাহাড়ের চেহারাটা আর একবার ভাল করে দেখে নিল। মোট দুটো চূড়া পাহাড়টার। একটা চূড়া আড়াই হাজার ফুটের মত উঁচুতে। যেন ছুরি দিয়ে আগাটা খ্যাঁচ করে কেটে ফেলা হয়েছে। ঘন জঙ্গলে ছাওয়া মাঝখানের উপত্যকা। মাঝে মাঝে ঝর্নাও দেখা যাচ্ছে। উত্তর পুব দিকটায় গাছপালা একটু কম। প্রথম চূড়াটাকে ছাড়িয়ে খাড়া উঠে গেছে দ্বিতীয় চূড়া। মাথাটা ন্যাড়া। অতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে লাল লাল পাথর।

'আগ্নেয় শিলার ওপর এসে পড়েছি আমরা,' বললেন ক্যাপ্টেন।

পায়ের তলায় জমাট বাঁধা লাভার ঢেউখেলানো স্তর। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ব্যাসল্ট আর পিউমিস পাথরের বড় বড় চাঁই।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে চতুষ্পদ জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখা গেল। দাগের নমুনা দেখে আন্দাজ করা যায় বড় জানোয়ার। কিন্তু ভয় পেলেন না ক্যাপ্টেন। ইণ্ডিয়ান বাঘ আর আফ্রিকান সিংহ মেরে অভ্যাস আছে তাঁর।

বড় পাহাড়টার পাদদেশে পৌঁছতে পৌঁছতে অগ্নুৎপাতের আরও চিহ্ন দেখা গেল। ছ'টা পাহাড়ী ছাগলের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এখানে। তিন লাফে পাহাড়ের ওপারে উধাও হয়ে গেল পাহাড়ী ছাগলের দল।

প্রথমে ছোট পাহাড়টায় উঠলেন অভিযাত্রীরা। দ্বীপের উত্তর দিকটায় ধু পানি আর পানি। দক্ষিণের বড় চূড়াটা দৃষ্টিপথে বাধার সৃষ্টি করায় ওদিকে কি আছে বোঝা গেল না।

দ্বিতীয় চূড়াটায় ওঠা আরম্ভ হলো এবার। জমে যাওয়া লাভার আনাচে কানাচে

জমে আছে গন্ধক। আগ্নেয়গিরির প্রলয়কাণ্ডের চিহ্ন দেখে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল অভিযাত্রীরা। তবে এখন আর হয়তো ভয় নেই। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বহু বছর আগেই মরে গেছে আগ্নেয়গিরি।

বড় চূড়াটায় পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে গেল। সুতরাং এখানেই রাত কাটানো স্থির করলেন ক্যাপ্টেন। আশেপাশে বিস্তর চকমকি পাথর পড়ে রয়েছে। কাজেই আগুন জ্বালাতে কোন অসুবিধে হলো না। ধীরে ধীরে সাঁঝ গড়িয়ে রাত হলো। মশালের আলোয় ডায়েরী লিখতে বসলেন স্পিলেট।

হার্বার্টকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। উদ্দেশ্য, ঘুমাবার আগে মশালের আলোয়ই আশপাশটা ঘুরে দেখবেন। খুঁজতে খুঁজতে বিশাল এক গহ্বরের সন্ধান পেলেন ক্যাপ্টেন। এখান দিয়েই বহু বছর আগে উঠেছিল তরল লাভার স্রোত। প্রকৃতির তৈরি সিঁড়ির ধাপ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে উপরের অন্ধকারে। একমুহূর্ত দ্বিধা করে উঠতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। আরও হাজার খানেক ফুট উপরে উঠে পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌঁছলেন শেষ পর্যন্ত।

চূড়ায় দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু অন্ধকারে দেখা গেল না কিছু। একসময় ঘড়িতে আটটা বাজল। হঠাৎ অন্ধকারের বুক চিরে ছোট্ট একটু রূপালি আলোর রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠল। চাঁদ উঠছে। এই সময়ই দেখা গেল নিচের সমতলে প্রতিবিম্বিত হয়ে কাঁপছে চাঁদের আলো। এর একটা অর্থই আছে। পানিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে চাঁদ। ওদিকটায়ও তাহলে সাগর।

'এটা মহাদেশ না, হার্বার্ট, দ্বীপ।' গম্ভীর গলায় বললেন ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং।

এগারো

ভোর হলো। তিরিশে মার্চ সেদিন। এটা দ্বীপ কিনা দিনের আলোয় ভালমত যাচাই করার জন্যে লাভার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল অভিযাত্রীরা। যদিও তারা জানে, ভুল হতে পারে না ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর।

দিনের আলোয় পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা গেল। ওদিকের কোথাও মাটির চিহ্নমাত্র নেই। দিগন্তের যদ্দূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। অতিকায় তিমির মত পানির মাঝখানে গা ভাসিয়ে পড়ে আছে দ্বীপটা।

দমে গেল সবাই।

একশো মাইলের মত পরিধি দ্বীপটার। খুঁটিয়ে দেখে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো সবার কাছে, দ্বীপটা মনুষ্যবসতিহীন। তবে আশপাশের কোন দ্বীপ থেকে নৌকোয় চেপে হানা দিয়ে বসতে পারে জংলীরা। পঞ্চাশ মাইলের ভেতর আর কোন দ্বীপের চিহ্ন দেখা না গেলেও আশঙ্কাটা থেকেই যাচ্ছে। দৃষ্টিসীমার বাইরে দ্বীপ নেই একথা হলপ করে বলা যায় না।

সময় নষ্ট করতে রাজি নন গিডিয়ন স্পিলেট। নোট বই বের করে দ্বীপটার একটা ম্যাপ এঁকে ফেললেন।

'একটা প্রস্তাব আছে আমার,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'জাহাজ রুটের বাইরে দ্বীপটা। সভ্যজগতে কোনদিন ফিরে যেতে পারব কিনা কে জানে! সুতরাং দ্বীপের পাহাড়-জঙ্গল, নদী, উপসাগর, আর অন্তরীপগুলোর নামকরণ করে ফেলতে চাই।'

রাজি হয়ে গেল সবাই। পেনক্র্যাফটই বলল প্রথমে, 'এ দ্বীপে প্রথম নামকরণ হয়েছে চিমনি গুহার। এ নামটাই বহাল থাকুক। আপত্তি আছে কারও?'

কেউই আপত্তি করল না। এর পরের নামকরণগুলোর বেশির ভাগই আমেরিকার বিখ্যাত জায়গার নামানুসারে করা হলো। কারণ অভিযাত্রীরা সবাই আমেরিকান। নেবের বাড়ি আফ্রিকায় হলেও এখন সে আমেরিকার অধিবাসী।

উপসাগর দুটোর একটার নাম রাখা হলো 'ইউনিয়ন বে' অন্যটা 'ওয়াশিংটন বে'। পাহাড়টার নাম 'ফ্র্যাঙ্কলিন হিল'। দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে কুমীরের লেজের মত বেরিয়ে থাকা উপদ্বীপটার নাম 'সার্পেন্টাইন পেনিনসুলা'। দ্বীপের আরেক প্রান্তের উপসাগরটা দেখলেই মনে হয় দু'ঠোঁট ফাঁক করে হাঁ হয়ে আছে একটা হাঙর। কাজেই ওটার নাম রাখা হলো 'শার্ক গালফ'। শার্ক গালফের দুটি অন্তরীপ। একটির নাম 'নর্থ ম্যাণ্ডিবল কেপ' অন্যটি 'সাউথ ম্যাণ্ডিবল কেপ'। বিশাল হ্রদটার নাম রাখা হলো 'লেক গ্র্যান্ট'। সমুদ্রসমতল থেকে লেকটা শ'তিনেক ফুট উঁচুতে।

চিমনি গুহাটা গ্র্যানাইট পাহাড়ের গোড়ায়। পাহাড়টার চূড়ায় সমতল জায়গা আছে খানিকটা। সেখানে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার দেখা যায় সবকটা উপসাগর। কাজেই জায়গাটার নাম হলো 'প্রসপেক্ট হাইট' অর্থাৎ খুঁটিয়ে দেখার বেদী। বেলুন যে নদীটার কাছে নেমে এসেছিল তার নাম রাখা হলো 'মার্সী রিভার' অর্থাৎ 'করুণা নদী।' দক্ষিণ-পুবের দ্বীপের প্রান্তটার নাম 'ক্রু কেপ'। ওদিকে তাকালে মনে হয় সাগরের কিনারে থাবা মেলে বসে আছে পাহাড়ী অঞ্চলটা, এজন্যেই জায়গাটাকে এ নামে ভূষিত করা হলো। প্রথম যে ছোট্ট দ্বীপটায় বেলুন থেকে লাফিয়ে নেমেছিল অভিযাত্রীরা তার নাম 'সেফটি আইল্যাণ্ড'। আর পুরো দ্বীপটার নাম রাখা হলো আমেরিকার ততকালীন প্রেসিডেন্টের নামে।

সেদিন ছিল আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালের তিরিশে মার্চ। এর মাত্র ষোলো দিন পরে গুড ফ্রাইডের দিন গুপ্তঘাতকের গুলিতে মারা গেলেন আব্রাহাম লিঙ্কন।

কিন্তু সেটা জানার কথা নয় লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের অভিযাত্রীদের।

বারো

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ক্যাপ্টেন বললেন, 'নতুন পথে চিমনিতে ফিরব আমরা। তাহলে আরও ভাল করে জানা যাবে দ্বীপটাকে। এই দ্বীপে প্রাকৃতিক সম্পদ কি আছে তাও খুঁজে দেখতে হবে। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যদি লিঙ্কন আইল্যাণ্ডেই থাকতে হয়, তাহলে সেভাবেই গুছিয়ে নিতে হবে জীবনটা।'

সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে, তখন ঘড়ির কাঁটা দুটো ঘুরিয়ে বারোটার ঘরে এনে রাখলেন ক্যাপ্টেন। দেখাদেখি স্পিলেটও ঘড়িতে হাত দিতেই বাধা দিলেন তিনি, 'রিচমণ্ডের সময় দিচ্ছে আপনার ঘড়ি। রিচমণ্ড আর ওয়াশিংটনের সময় একই। রোজ নিয়মিত চাবি দিতে থাকুন ঘড়িতে। পরে কাজে লাগবে সময়টা।'

লাঞ্চ সেরে লেক গ্র্যান্ট দেখতে বেরোলেন অভিযাত্রীরা। বৃষ্টির পানিতে নিশ্চয় ভরে যায় হ্রদ। হ্রদের বাড়তি পানি কোথায় কোন্ নদীতে গিয়ে পড়ছে দেখতে চান ক্যাপ্টেন। এদিকে ওদিকে ছড়ানো গ্র্যানাইটের স্তূপ। আগ্নেয় পাথরের ছোট ছোট পাহাড় মাথা তুলে আছে বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে।

প্রকৃতির এই মুক্ত পরিবেশে এসে হঠাৎ উদ্দাম আদিমতায় পেয়ে বসল অভিযাত্রীদের। ক্যাপ্টেন আর সাংবাদিককে পেছনে ফেলে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করল বাকি তিনজন। নেবের চিৎকারটা শোনা গেল তখনই। চমকে উঠে দেখলেন স্পিলেট আর হার্ডিং, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে হার্বার্ট। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। একটু দূরে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে পেনক্র্যাফট আর নেব।

'ধোঁয়া, ক্যাপ্টেন, ধোঁয়া!'

'ধোঁয়া! কোথায়?'

'ওই, ওই যে,পাহাড়ের আড়ালে। জংলী ছাড়া আর কে আগুন জ্বালবে? বেটারা নরখাদক হলেই গেছি।'

কথা শুনে ক্যাপ্টেনেরও মুখ শুকিয়ে গেল। নিরস্ত্র অবস্থায় জংলীদের বিরুদ্ধে কি করে দাঁড়াবেন ওঁরা? স্পিলেটকে বললেন, 'চুপিচুপি এগিয়ে দেখলে কেমন হয়?'

'চলুন,' দেখে মনে হলো একটুও ভয় পাননি স্পিলেট।

পাহাড়ের গায়ে গা মিলিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে উপরে উঠতে শুরু করলেন দু'জনে। আগুনটার কাছাকাছি পৌঁছে অতি সাবধানে উঁকি মেরে দেখলেন ক্যাপ্টেন। পরক্ষণেই গলা ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। অন্যেরাও উঠে এসেছে ক্যাপ্টেনের পিছনে পিছনে। হতভম্ব হয়ে ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল সবাই। হাসতে হাসতে বললেন ক্যাপ্টেন, 'আগুনই, মি. স্পিলেট। তবে মানুষের জ্বালানো নয়, গন্ধকের গুঁড়োর হলদে ধোঁয়া। গলার ঘায়ের চমৎকার ওষুধ এই গুঁড়ো।'

'তাই নাকি!' লাফ মেরে কাছে এসে দাঁড়ালেন স্পিলেট। সাথে সাথে আর সবাই পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে নীল আগুনের স্রোত। পাথরের গা বেয়ে নামতে নামতে বাতাসের অক্সিজেন শুঁষে নিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডের কড়া গন্ধ ছড়াচ্ছে তরল গন্ধক।

'দেখেছেন?' বললেন ক্যাপ্টেন, 'গন্ধকের আগুনের রঙ হয় নীল, লাল নয়।'

'কিন্তু ব্যাপার কি, ক্যাপ্টেন?' জিজ্ঞেস করলেন স্পিলেট, 'নীল আগুন ছড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে গন্ধকের স্রোত বয়ে চলেছে কেন?'

'আশপাশের গ্র্যানাইট পাথর দেখলেই এর কারণ বোঝা যায়। এককালে যথেষ্ট অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভা জমে জমে সৃষ্টি হয়েছে এই গ্র্যানাইট পাহাড়। হয়তো কোথাও কোন জ্বালামুখ এখনো একেবারে নিভে যায়নি। ভূগর্ভের তরল লাভা অল্পমাত্রায় বেরিয়ে বেরিয়ে এই গন্ধক কুণ্ডে জমা হচ্ছে।'

কথাটা বলে তেলতেলে পানিতে আঙুল ডোবালেন ক্যাপ্টেন। জিভে ছোঁয়ালেন—বেশ মিষ্টি। অনুমান করলেন পানির তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট। থার্মোমিটার ছাড়াই কিভাবে তাপমাত্রা আন্দাজ করা যায় তা হার্বার্টকে বুঝিয়ে দিলেন, 'হাত ডুবিয়ে দেখো, পানিটা গরমও না ঠাণ্ডাও না। তার মানে তোমার দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রার সমান। আর তোমার দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত? পঁচানব্বই ডিগ্রী ফারেনহাইট।'

বিকেল নাগাদ লেক গ্র্যান্টের কাছে পৌঁছে গেল অভিযাত্রীরা। লেকের চারপাশে গাছপালার ছড়াছড়ি। রঙবেরঙের পাখি নেচে বেড়াচ্ছে গাছের ডালে ডালে। বেশির ভাগ গাছই ইউক্যালিপটাস আর ক্যাসুয়ারিনা গোষ্ঠীর। অস্ট্রেলিয়ান দেবদারুও আছে প্রচুর। নিউজিল্যাণ্ডের টুসাক ঘাসে ছাওয়া বনভূমি। কিন্তু এখন পর্যন্তও একটা নারকেল গাছ চোখে পড়ল না।

ডানা মেলে লেজ নাচিয়ে ছুটছে সাদা,কালো, ধূসর কাকাতুয়া। রামধনুর রঙে

চোখ ধাঁধিয়ে উড়ছে বার্ড-অব-প্যারাডাইজ। একই অঙ্গে লাল, নীল, সবুজের গভীর ছোপ লাগিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছে মাছরাঙা।

হঠাৎ জন্তু জানোয়ারের সম্মিলিত তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকারে চাপা পড়ে গেল পাখির ডাক। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ঝোপের মধ্যে দৌড়ে গেল হার্বার্ট আর নেব। তীক্ষ্ণ শব্দ সৃষ্টিকারী প্রাণীটাকে চেনে নেব। এক ধরনের পাখি। এদের গোশত খেতে চমৎকার। ডালের গদা দিয়ে বেশ ক'টা পাখিকে পিটিয়ে মারল নেব।

অপূর্ব সুন্দর কতগুলো পায়রা দেখল হার্বার্ট। ওদের উজ্জ্বল হলদে শরীরে বিকেলের পড়ন্ত রোদ পড়ে চকচকে সোনালী আভার সৃষ্টি করেছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল হার্বার্ট—একটা শটগান হলে মন্দ হত না।

হঠাৎ ঝোপঝাড়ের মাথার ওপর দিয়ে লাফ মেরে ছিটকে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক চতুষ্পদ প্রাণী।

'ক্যাঙারু, ক্যাঙারু!' খুশির ঠেলায় চেঁচাতে শুরু করল হার্বার্ট।

'খেতে কেমন?' জিজ্ঞেস করল পেনক্র্যাফট।

'খেতে কেমন জিজ্ঞেস করছ? ভেড়ার গোশত খেয়েছ কখনও?'

আর শোনার অপেক্ষা করল না পেনক্র্যাফট। গদা হাতে তাড়া লাগাল ক্যাঙারুগুলোকে। হার্বার্ট আর টপও ছুটল পেছন পেছন। টেনিস বলের মত ডুপ খেতে খেতে উধাও হয়ে গেল ক্যাঙারুর দল। হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল শিকারীরা।

'একটা কথা, ক্যাপ্টেন।' ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বলল পেনক্র্যাফট।

'কি?'

'গাছের ডাল দিয়ে শিকার করা কি সম্ভব? দেখলেন তো কি দৌড়টাই না দিতে হলো। একটা বন্দুক-টন্দুক যদি বানিয়ে দিতেন।'

'সে পরে দেখা যাবে। আপাতত কিছু তীর ধনুক বানিয়ে দিচ্ছি।'

'তীর ধনুক!' ঠোঁট উল্টে বলল পেনক্র্যাফট, 'ও দিয়ে কি হবে?'

'কি হবে? ক'দিন হলো বন্দুক আবিষ্কার হয়েছে? এর আগে তীর ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করত না লোকে?'

আবার কিছু খেয়ে নিয়ে রওনা দিল অভিযাত্রীরা বন-জঙ্গল, চড়াই উৎরাই পেরিয়ে নতুন জায়গা আর জিনিস দেখতে দেখতে পথ চলতে লাগল ওরা। হঠাৎ তিনটে ক্যাপিবারার পথ আটকে দাঁড়াল টপ। গদা দিয়ে পিটিয়ে দুটোকে সাবাড় করে দিল হার্বার্ট, পেনক্র্যাফট আর নেব। খুশিতে লাফাতে শুরু করল পেটুক পেনক্র্যাফট।

হাঁটতে হাঁটতে একটা নদীর কাছে পৌঁছে গেল ওরা। নদীর মাটির রঙ লাল। মাটিতে আকরিক লোহার প্রাধান্য থাকলেই এরকম হয়। নদীটার নাম দেয়া হলো 'রেডক্রীক'।

সারাটা দিন লেক গ্র্যান্টের আশপাশে ঘুরে বেড়িয়ে, বিকেল নাগাদ মার্সি নদীর বাঁ তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন চিমনিতে পৌঁছল অভিযাত্রীরা, সাঁঝের আঁধার নামছে তখন। হতাশ হলেন ক্যাপ্টেন হার্ডিং। এত ঘুরেও হ্রদের বাড়তি পানি কোথায় যায় খুঁজে পেলেন না।

রাতের খাওয়া শেষে আগুনের পাশে গোল হয়ে বসল সবাই। পকেট থেকে একে একে কয়েকটা জিনিস বের করলেন ক্যাপ্টেন হার্ডিং। জিনিসগুলো খনিজ লোহা, চুন, কয়লা আর কাদামাটি। সারাদিন ধরে নমুনাগুলো সংগ্রহ করে পকেটে ভরে রেখেছেন তিনি।

সবাই জিনিসগুলোর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই বললেন ক্যাপ্টেন, 'প্রাকৃতির সম্পদকে কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ। কাল থেকে সে-কাজই

শুরু করতে হবে আমাদের।'

তেরো

পরদিন সকালে খাওয়া-দাওয়ার পর কাজের জন্যে তৈরি হলো সবাই। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে সবকিছু। ক্যাপ্টেন বললেন, 'কাঠ আর কয়লার অভাব নেই দ্বীপে। শুধু তন্দুরটা হলেই আগুনে পুড়িয়ে মাটির বাসন পেয়ালা তৈরি করে ফেলা যাবে।'

'তন্দুর!' অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করল পেনক্র্যাফট, 'তন্দুর পাব কোথায়?'

'বানিয়ে নেব। ইট দিয়ে।'

'ইট পাব কোথায়?'

'কাদামাটি দিয়ে বানিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নিতে হবে। ইট পোড়ানোর জায়গাতেই খাড়া করব তন্দুরটা। তাতে ঝামেলা কমবে, সময়ও বাঁচবে। চিমনি থেকে খাবার পৌঁছানোর দায়িত্ব থাকবে নেবের ওপর।'

'ইট তৈরির কারখানাটা কোথায় বসাব?'

'হ্রদের পশ্চিম তীরে। প্রচুর কাদামাটি আছে সেখানে। কাল দেখে এসেছি আমি।'

'শিকারের হাতিয়ারের কিন্তু বড় অভাব আমাদের,' স্পিলেট বললেন।

'ইস, এখন যদি অন্তত একটা ছুরিও থাকত!' আক্ষেপ করে বলল পেনক্র্যাফট।

'ছুরি, তাই না? তাহলে একটা ছুরি দরকার?' বলতে বলতে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। টপের দিকে চোখ পড়তেই কি যেন ভাবলেন। তারপর ডাকলেন, 'টপ, এদিকে আয় তো।'

টপ কাছে এসে দাঁড়াতেই ওর গলা থেকে বেল্টটা খুলে নিলেন ক্যাপ্টেন। দু'হাতে চাপ দিয়ে বেল্টে আটকানো টেম্পার্ড স্টিলের বকলসটা মাঝখান থেকে দু'টুকরো করে ভাঙলেন। পেনক্র্যাফটের দিকে টুকরো দুটো এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। পাথরে ঘষে শান দিয়ে নিলেই দুটো ছুরি পেয়ে যাবে তুমি।'

প্রায় দু'ঘণ্টা খরচ করে অদ্ভুত ছুরিতে শান দিয়ে নিল পেনক্র্যাফট। তারপর গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিল সবাই। মার্সি নদীর পাড় বেয়ে, প্রসপেক্ট হাইটকে পেছনে ফেলে, মাইল পাঁচেক পথ পেরিয়ে জঙ্গলের কাছে একটা ঘাস জমিতে পৌঁছুল অভিযাত্রীরা। এখান থেকে দু'শো ফুট দূরে লেক গ্র্যান্ট।

জঙ্গলে এক ধরনের গাছের সন্ধান পেল হার্বার্ট। বাঁশ গাছের মত এসব গাছ দিয়ে ধনুক বানায় আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা। অন্য এক ধরনের গাছের ছাল দিয়ে তৈরি হয় ছিলা। ওই গাছ দিয়েই ধনুক বানানো হলো কয়েকটা। এখন বাকি শুধু তীর আর তীরের ফলা।

এপ্রিলের দুই তারিখে মৌলিক পদ্ধতিতে দ্বীপের মধ্য-রেখা নির্ণয় করলেন ক্যাপ্টেন। আগের দিনই দেখে রেখেছেন কোন বিন্দুতে অস্ত গেছে সূর্য। আজকে কোন বিন্দুতে সূর্য উঠেছে তাও খেয়াল করছেন। কালকে ঘড়ি দেখে ঠিক করেছেন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বারো ঘণ্টা ছাব্বিশ মিনিট। তার মানে ঠিক ছ'ঘণ্টা তেরো মিনিট পর মধ্যরেখা পেরিয়ে যাবে সূর্য।

হ্রদের তীর খুঁজে খুঁজে ইট বানানোর উপযোগী মাটি জোগাড় করে কাজে

লেগে গেল সবাই। সামান্য একটু বালি মিশিয়ে নিয়ে হাত দিয়ে টিপে টিপেই ইট বানানো চলতে লাগল। ইটের ধারগুলো একটু এবড়োখেবড়ো হলেও মোটামুটি কাজ চালানো যাবে। দু'দিনেই হাজার তিনেক ইট তৈরি হয়ে গেল। দিন চারেক পর দেখা গেল তন্দুর বানানোর পক্ষে যথেষ্ট ইট রোদে শুকাচ্ছে। প্রচুর ইট পোড়ানোর জন্যে প্রচুর কাঠও জোগাড় করা হলো। শিকার অভিযানও চলতে লাগল এরই ফাঁকে ফাঁকে।

বনে নিরীহ প্রাণীদের সাথে সাথে হিংস্র প্রাণীর দেখা পাওয়া গেল। জাগুয়ারের মত এক ধরনের প্রাণী দেখলেন স্পিলেট। কোনমতে একটা বন্দুকের বন্দোবস্ত করতে পারলেই ওগুলোকে মেরে শেষ করবেন, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি। একদিন তীরের ফলার বন্দোবস্তও করে ফেলল টপ। ঝোপের ভেতর থেকে একটা শজারু মেরে নিয়ে এল সে। শজারুর কাঁটা বেছে মসৃণ কাঠির মাথায় বেঁধে নিতেই চমৎকার তীর তৈরি হয়ে গেল।

এই তীর দিয়ে অবশ্য জাগুয়ার মারা সম্ভব নয়। ভয়ে তাই বনের খুব গভীরে ঢোকে না কেউ। ইট নিয়ে ব্যস্ত থাকায় চিমনির দিকে খেয়াল ছিল না কারোই। থাকার একটা নতুন জায়গা ছাড়া আর চলছে না—ভাবলেন ক্যাপ্টেন। চিমনিতে ফাঁক ফোঁকর প্রচুর, তাছাড়া জোয়ার এলেই গুহার ভেতর ঢুকে পড়ে সাগরের পানি।

নোট বইয়ে রীতিমতই ডাইরী লিখে রাখছেন স্পিলেট। সেদিন পাঁচই এপ্রিল বলে জানালেন তিনি। অর্থাৎ দ্বীপে নামার পর বারো দিন পেরিয়ে গেছে।

ছয়ই এপ্রিল তৈরি হয়ে গেল তন্দুর। ওটার মধ্যে জ্বালানী কাঠ ঠেসে ভরে সন্ধ্যার দিকে আগুন দেয়া হলো। উত্তেজনা আর উদ্বেগে সে রাতে কারোই ভাল ঘুম হলো না। ঝাড়া দু'দিন ধরে ইট পুড়বার পর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে লাগল ঝামা ইটের পাঁজা, অপরিশুদ্ধ চুনাপাথর সংগ্রহ করা হলো হ্রদের ধার থেকে। ওগুলো আগুনে পোড়াতেই কার্বনিক অ্যাসিড ঝরে গিয়ে কুইক লাইম বেরিয়ে এল। তার সাথে বালি আর পাথর মিশিয়ে তৈরি হলো ইট গাঁথার মশলা। ইট দিয়ে বাসন পোড়াবার ভাটি বানালেন ক্যাপ্টেন। পাঁচদিন পর রেডক্রীকের মুখে মাটিতে পড়ে থাকা কয়লা এনে ভাটিতে ঠাসা হলো। তন্দুরে আগুন দিতেই বিশ ফুট উঁচু চিমনি দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল।

কাদামাটির সাথে চুন আর বেলে পাথর মিশিয়ে বাসনের মশলা বানালেন ক্যাপ্টেন. যেমন তেমন একটা কুমোরের চাকা বানিয়ে থালা, বাটি, গেলাস সবই তৈরি করা হলো। আনাড়ি হাতে বানানো ওসব জিনিসই মহা মূল্যবান মনে হতে লাগল ওদের কাছে। চুন কাদার এই মিশেলটির ইংরেজি নাম 'পাইপ ক্লে'। তামাক খাওয়ার চমৎকার পাইপ বানানো যায় এই কাদা দিয়ে। কয়েকটা পাইপ বানিয়ে নিল তামাকখোর পেনক্র্যাফট। কিন্তু তামাক কোথায়? কথাটা মনে হতেই হতাশ ভাবে পাইপগুলোর দিকে চেয়ে রইল সে।

পনেরোই এপ্রিল মাটির তৈজস পত্র নিয়ে চিমনিতে ফিরে এল অভিযাত্রীরা। বনমোরগের ঝোল আর ক্যাপিবারার রোস্ট দিয়ে রাতের খাওয়া হলো। খাওয়ার পর হার্বার্টকে নিয়ে চিমনির বাইরে এসে তারাজ্বলা আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। সন্ধ্যা তখন আটটা। মিনিট কয়েক চুপ করে থেকে বললেন তিনি, 'আজ পনেরোই এপ্রিল, না, হার্বার্ট?'

'হ্যাঁ,' আস্তে করে উত্তর দিল হার্বার্ট।

'কাল ষোলো। বছরের যে চারদিন প্রকৃত সময় গড়পড়তা সময়ের সমান হয়, কাল সে-ই চারদিনের একটা দিন। কাল কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় মধ্য আকাশে

মধ্যরেখা অতিক্রম করবে সূর্য। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলেই দ্বীপের লংগিচিউড বের করা যাবে।'

'সেক্সট্যান্ট কোথায় পাবেন?'

'শুধু তাই নয়,' হার্বার্টের কথার উত্তর না দিয়েই বললেন ক্যাপ্টেন। 'আকাশে মেঘ নেই যখন, সাদার্নক্রস তারার উচ্চতা বের করে দ্বীপের ল্যাটিচিউড বের করে ফেলব।'

মশালের আলোয় কাজে লেগে গেলেন ক্যাপ্টেন। কাঠ কেটে দুটো চ্যাপ্টা স্কেলের মত কাঠি বানিয়ে বাবলার কাঁটা দিয়ে একটা দিক এঁটে দিতেই কম্পাস তৈরি হয়ে গেল। তারপর সাথীদের নিয়ে প্রসপেক্ট হাইটে উঠলেন তিনি। দক্ষিণ দিগন্তে তখন ঝিকমিক করছে চাঁদ।

দক্ষিণ মেরু ঘেঁষে আলফা নক্ষত্রের উপরিভাগে হঠাৎ যেন আকাশ ফুঁড়ে আবির্ভূত হলো সাদার্নক্রস। দক্ষিণ মেরু থেকে আলফার ব্যবধান সাতাশ ডিগ্রী। কম্পাসের একটা কাঁটা আলফার দিকে, অন্যটা সাগর দিগন্তের দিকে ফেরালেন ক্যাপ্টেন। দিগন্ত থেকে আলফার কৌণিক দূরত্ব পাওয়া গেল। এখন অংক কষলেই দিগন্ত থেকে আলফার উচ্চতা বের করে নেয়া যাবে। ওই কৌণিক দূরত্বের ওপরই নির্ভর করছে ল্যাটিচিউড। হিসেবটা আগামী দিনের জন্য মুলতবী রেখে চিমনীতে ফিরে এলেন সবাই।

পরদিন ঈস্টার সানডে। কাজেই সেদিন আর কোন কাজ করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিল অভিযাত্রীরা। বিকেল নাগাদ ক্যাপ্টেন এক অসাধারণ আবিষ্কার করে বসলেন। একটা গাছ—নাম ওয়ার্ম উড। এ গাছ শুকিয়ে পটাশিয়াম নাইট্রেটে চুবিয়ে নিলে দেশলাইয়ের মত দাহ্য পদার্থ তৈরি করা যায়। খুঁজতে খুঁজতে পটাশিয়াম নাইট্রেট অর্থাৎ সোরারও সন্ধান পাওয়া গেল।

সারাটা দ্বীপে প্রাকৃতিক সম্পদের ছড়াছড়ি। ক্রমেই আশায় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে অভিযাত্রীদের অন্তর। নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পাচ্ছে ওরা নিজেদের। আবিষ্কার করছে নিজেদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা।

চোদ্দ

আপজোকের কাজ শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। আগের রাতের অর্ধেক বের করে রাখা ল্যাটিচিউডের কাজ শেষ করতে হবে, তাই সাগরতীর থেকে বিশ ফুট আর পাহাড় থেকে পাঁচশো ফুট দূরে একটা বারো ফুট লম্বা লাঠি পুঁতলেন ক্যাপ্টেন। লাঠিটার দু'ফুট রইল মাটির তলায়, দশফুট ওপরে। তারপর পিছু হটতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। মাঝে মাঝে মাটিতে শুয়ে পড়ে দেখলেন লাঠির মাথা পাহাড়ের চূড়ার সাথে এক সরলরেখায় দেখা যাচ্ছে কিনা। যেখান থেকে সরলরেখায় দেখা গেল সেখানে একটা কাঠি পুঁতলেন। মেপে দেখা গেল কাঠি থেকে লাঠির দূরত্ব পনেরো ফুট আর পাহাড়ের দূরত্ব পাঁচশো ফুট। এবার শুরু হলো জ্যামিতির হিসাব। হার্বার্টকে বোঝালেন, সমকোণী ত্রিভুজ আকারে ছোট বড় হলেও অনুরূপ ভুজগুলো সমানুপাতিক। ঝিনুক দিয়ে মাটিতে অংক কষে পাহাড়ের উচ্চতা বের করে ফেললেন তিনি। পাহাড়টার উচ্চতা দেখা গেল তিনশো তেত্রিশ ফুট।

পাহাড়ের উচ্চতা মাপা শেষ করে আগের রাতে বানানো কাঁটা কম্পাস নিয়ে

বসলেন ক্যাপ্টেন। বালির ওপর একটা বৃত্ত এঁকে বৃত্তটাকে ৩৬০ ভাগে ভাগ করলেন। কাঁটা কম্পাসের দুই কাঁটার মাঝখানের কৌণিক দূরত্ব পাওয়া গেল। কম্পাসের হিসেব অনুযায়ী দক্ষিণ মেরু থেকে আলফার উচ্চতা ২৭ ডিগ্রী। কৌণিক দূরত্বের সঙ্গে জোড়া হলো। এই ২৭ ডিগ্রী পাহাড়ের উচ্চতাকে সমুদ্রপৃষ্ঠের পর্যায়ে এনে অংক কষতেই সব মিলিয়ে হলো ৫৩ ডিগ্রী। মেরু থেকে নিরক্ষরেখা ৯০ ডিগ্রী। এখন ৯০ ডিগ্রী থেকে ৫৩ ডিগ্রী বাদ দিয়ে থাকল ৩৭ ডিগ্রী।

'লিঙ্কন দ্বীপের দক্ষিণ ল্যাটিচিউড হচ্ছে সাঁইতিরিশ ডিগ্রীর কিছু কম বা বেশি—অর্থাৎ পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।' মাথা তুলে সঙ্গীদেরকে ফলাফল জানালেন ক্যাপ্টেন।

এবার লংগিচিউড নির্ণয় করতে হবে। ওটা দুপুরের জন্য মুলতবী রেখে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন ক্যাপ্টেন। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন সবাই হ্রদের উত্তর পাড় আর শার্ক গালফের মাঝখানে। অসংখ্য সীল মাছ রোদ পোহাচ্ছে গালফের তীরে। এদিক ওদিক বালির উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শাঁখ, ঝিনুক আর শামুকের খোলা। হাঁটু জলে ঝিনুকের বিরাট খেত আবিষ্কার করল নেব। এই ঝিনুকের ভেতরই মুক্তো পাওয়া যায়। মুক্তোর খেতের দিকে খেয়াল নেই ক্যাপ্টেনের। সীলমাছগুলোর দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন তিনি, 'আবার আসতে হবে এখানে।'

হঠাৎ কি মনে হতে ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। সাগর-তীরে পরিষ্কার জায়গা দেখে ছ'ফুট লম্বা একটা লাঠি পুঁতে মাথাটা সামান্য দক্ষিণে হেলিয়ে দিলেন। তৈরি হয়ে গেল সূর্য ঘড়ির কাঁটা। কাঠির ছায়ার দিকে নজর রাখলেন হার্ডিং। ছায়া যখন সবচেয়ে ছোট হবে, বুঝতে হবে দুপুর ঠিক বারোটা বেজেছে। ছোট ছোট কাঠি পুঁতে ছায়ার ছোট হওয়ার হিসেব রাখতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। ছায়া যখন একেবারে ছোট হয়ে আবার বড় হতে যাচ্ছে তখন স্পিলেটকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কটা বাজে?'

'পাঁচটা বেজে এক মিনিট।' রিচমণ্ডের সময়ের সঙ্গে মেলানো ঘড়ির সময় বললেন স্পিলেট।

হিসেব শুরু করলেন হার্ডিং। ওয়াশিংটন থেকে লিঙ্কন দ্বীপের ব্যবধান হলো পাঁচ ঘন্টার। ঘন্টায় পনেরো ডিগ্রী পথ অতিক্রম করছে সূর্য। মানে পাঁচ ঘন্টায় পঁচাত্তর ডিগ্রী। গ্রীনউইচের সাতাত্তর ডিগ্রী পশ্চিমে অবস্থিত ওয়াশিংটন। লিঙ্কন দ্বীপের লংগিচিউড হচ্ছে ১৫২ ডিগ্রী (পশ্চিম) অর্থাৎ ১৫০ থেকে ১৫৫-এর মধ্যে। সোজা কথায় সভ্যলোকের সাথে কোন যোগাযোগ নেই লিঙ্কন দ্বীপের। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশে কোন দ্বীপের চিহ্ন কখনও কোন ম্যাপে দেখেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। লিঙ্কন দ্বীপ থেকে তাহিতি এবং প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জের দূরত্ব কম করে হলেও বারোশো মাইল। নিউজিল্যাণ্ড এখান থেকে আঠারোশো মাইলেরও বেশি দূরে। আর প্রায় সাড়ে চার হাজার মাইলের মত দূরে হবে আমেরিকার উপকূল। ভেলায় করে এত পথ পাড়ি দেয়া অসম্ভব, নৌকো দরকার।

পরদিন সতেরোই এপ্রিল। আলোচনায় বসলেন দ্বীপবাসীরা। তৈজস পত্র তৈরি শেষ, এবার যন্ত্রপাতি দরকার। আর ভাল নৌকো বানাতে হলে তো যন্ত্রপাতি ছাড়া গতিই নেই। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ছড়িয়ে থাকা প্রচুর খনিজ-পদার্থকে কাজে লাগাতে হলে একটা লোহার কারখানা দরকার। আর সবচে' বড় দরকার শীত আসার আগেই একটা বাসোপযোগী আশ্রয়। শীতকালে চিমনিতে থাকা যাবে না কোনমতেই।

বন্দুক না থাকায় পেনক্র্যাফটের দুঃখের সীমা নেই। স্পিলেট অবশ্য আশার

বাণী শুনিয়ে যাচ্ছেন, 'বন্দুক বানানো আসলে এমন কিছুই না। বন্দুকের জন্যে খনিজ পদার্থ, কার্তুজের জন্যে সোরা, কয়লা, গন্ধক আর সীসা চাই। এসব জিনিসের অভাব নেই দ্বীপে। কাজেই ওই জিনিসটা একদিন না একদিন বানানো হয়ে যাবেই—বিশেষ করে ক্যাপ্টেন যখন আছেন।'

'অত সোজা না,' হেসে বললেন ক্যাপ্টেন। 'বন্দুক বানাতে উন্নত কারিগরি আর অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দরকার।'

মাটিতে পরিশোধিত অবস্থায় থাকে না ধাতু। অক্সিজেন অথবা গন্ধকের সাথে মিশে থাকে। দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে প্রচুর আকরিক লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে. আয়রন সালফাইড আর আয়রন অক্সাইডকে প্রচণ্ড উত্তাপে গলালে ময়লা বাদ গিয়ে বেরিয়ে পড়বে খাঁটি ইস্পাত। কিন্তু ওই পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি করাটাই আসল সমস্যা।

'সেফটি আইল্যাণ্ড থেকে কয়েকটা সীল মেরে আন, পেনক্র্যাফট,' হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন। 'লোহা সাফ করতে হবে।'

'সীল দিয়ে লোহা সাফ করবেন?' একটু অবাক হলো পেনক্র্যাফট।

'লোহা গরম করতে হলে হাপর দরকার, সীলের চামড়া নিয়ে হাপর বানাব।'

পানিতে সীল শিকার খুবই কঠিন ব্যাপার। ওস্তাদ সাঁতারু ওরা। কাজেই সীলেরা ডাঙায় না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইল পেনক্র্যাফট, হার্বার্ট আর নেব। ঘন্টখানেক অপেক্ষার পর পানি ছেড়ে বালির চড়ায় উঠে এল ছ'টা সীল। একলাফে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পেনক্র্যাফট আর হার্বার্ট। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল দুটো সীল। বাকিগুলো ঝাঁপ দিল পানিতে। তিনজনে মিলে চামড়া ছাড়িয়ে নিল সীল দুটোর। শুধু চামড়া দুটো নিয়ে চিমনিতে ফিরে এল ওরা। কাঠের ফ্রেমে আটকে ভাল করে শুকানো হলো চামড়া দুটো। গাছের ছাল পাকিয়ে তৈরি হলো মজবুত দড়ি। তিনদিনেই তৈরি হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের হাপর।

পরদিন বিশে এপ্রিল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই রেডক্রিকের দিকে রওনা হয়ে গেল সবাই। বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ঝোপঝাড় কেটে পথ করে এগোতে হলো ওদের। এতে আরও একটা লাভ হলো। ফ্র্যাঙ্কলিন হিল আর প্রসপেক্ট হাইটের মাঝে একটা সোজা রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। জঙ্গলে জ্যাকামার পাখিই বেশি। তাই জঙ্গলের নামটাও দিয়ে ফেলল 'জ্যাকামার ফরেস্ট'। পথ চলতে চলতে তীর ধনুক দিয়েই ক্যাঙারু মেরে ফেলল হার্বার্ট আর স্পিলেট। শজারু আর পিপীলিকা ভুখ এর মাঝামাঝি দেখতে একটা জানোয়ারও মারা পড়ল। ঘোঁত ঘোঁত করে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে গেল একটা দাঁতাল শুয়োর, বাধা পেলে সাঙ্ঘাতিক রকম হিংস্র হয়ে ওঠে এরা।

জ্যাকামার ফরেস্ট পেরিয়ে রেডক্রীকে পৌঁছুতে পাঁচটা বেজে গেল। নদী থেকে শ'খানেক গজ দূরে একটা কুঁড়েঘর তৈরি করে নিল ওরা। সেদিন আর কিছু করা যাবে না। আগুনের কুণ্ড জ্বেলে একজনকে পাহারায় রেখে শুয়ে পড়ল বাকি সবাই।

একুশে এপ্রিল ভোর হতেই কাজে লেগে গেল ওরা। শিরার মত সরু সরু লোহার স্তর খুঁজে বের করলেন ক্যাপ্টেন। মাটির ওপর আনগা ভাবে পড়ে থাকা প্রচুর কয়লাও পাওয়া গেল। মাটি দিয়ে চোঙা বানিয়ে হাপরে পরানো হলো। পর পর বিছানো হলো কয়লা আর লোহার স্তর। উত্তপ্ত লোহা আর কয়লার ফাঁক দিয়ে ঢুকবে হাপরের হাওয়া। পদ্ধতিটা প্রাচীন কিন্তু কার্যকরী। হাপরের হাওয়ায় কয়লা প্রথমে কার্বনিক অ্যাসিডে পরিণত হবে, তারপর কার্বন মনোক্সাইডে। ফলে আয়রন

অক্সাইড থেকে বেরিয়ে যাবে অক্সিজেন। থাকবে শুধু আয়রন।

এভাবে লোহা পাওয়া যেতেই তা দিয়ে হাতুড়ি, কাঁচি, খুন্তি, কুড়াল, কোদাল একটার পর একটা তৈরি হয়ে গেল। তরল লোহার সাথে পরিমাণ মত কয়লা মিশিয়ে ইস্পাত পর্যন্ত বানিয়ে ফেললেন ক্যাপ্টেন। এভাবেই বুদ্ধি আর মেহনতের জোরে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করে ফেলল ওরা। ইস্পাতের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে পাঁচই মে চিমনিতে ফিরে এল সবাই।

মে মাসের ছ'তারিখে আকাশের অবস্থা দেখে চিন্তা বেড়ে গেল ওদের। শীত আসতে দেরি নেই। তার ওপর আরও একটা কথা বললেন ক্যাপ্টেন, 'এসব নির্জন দ্বীপে প্রায়ই আস্তানা গাড়তে আসে মালয়ী জলদস্যুরা। শীঘ্রিই চিমনি ছেড়ে একটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ গুহায় আশ্রয় না নিলে চলছে না আর।'

কোথায় পাওয়া যাবে সে রকম আস্তানা? চিমনির চেয়ে বড় গুহা কোথায়? পাহাড় খুঁড়ে নতুন গুহা বানানো সোজা কথা নয়। কাজেই গুহা খুঁজতে লেগে গেল ওরা। গুহা খুঁজতে গিয়ে সারা নেকটা ঘুরে এসেছেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু একটা রহস্যের মীমাংসা করতে পারলেন না কিছুতেই। রেডক্রীকের পানি হ্রদে এসে পড়ছে, কিন্তু বেরোচ্ছে কোন্ দিক দিয়ে? নিশ্চয়ই বাড়তি পানি বেরিয়ে গিয়ে সাগরে পড়ছে। নাহলে পানিতে সয়লাব হয়ে যেত আশপাশটা।

'যেখান দিয়ে খুশি বেরোক না ওটার পানি, তাতে আমাদের কি?' ক্যাপ্টেনের রকম সকম দেখে বললেন স্পিলেট।

'আমাদের কি? বাড়তি পানি যদি মাটির নিচে কোন সুড়ঙ্গ পথে বেরোয় তাহলে সেটাকে বাড়ি বানালে চমৎকার হয় না?'

এবার বুঝলেন স্পিলেট, হ্রদের পানি বেরোনোর পথটা খুঁজে পাওয়ার জন্যে ক্যাপ্টেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন।

হ্রদের পাড়ে হাঁটতে হাঁটতে বিশাল এক সাপ দেখে চেঁচাতে লাগল টপ। চোদ্দ পনেরো ফুট লম্বা হবে সাপটা। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সাপটাকে মেরে ফেলল নেব।

'ঢোঁড়া জাতীয় সাপ, নির্বিষ,' বললেন ক্যাপ্টেন।

হ্রদ আর রেডক্রীকের সঙ্গমস্থলে এসে পৌঁছতেই কেন যেন ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠল টপ। হ্রদের কাছে ছুটে গিয়ে পরক্ষণেই ফিরে আসছে। কখনও পানির ধারে থমকে দাঁড়িয়ে মনিবের দিকে চেয়ে কি যেন বোঝাতে চাইছে। হ্রদের পানিতে কি কিছু দেখতে পেয়েছে টপ? একটু অবাক হলেন ক্যাপ্টেন। হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল টপ।

'এই, টপ, উঠে আয় জলদি।' ডাকলেন ক্যাপ্টেন।

'ওখানকার পানিতে নিশ্চয় আছে কিছু,' হার্বার্ট বললেন।

'কুমীর না তো?' স্পিলেট জিজ্ঞেস করলেন।

'না। এ ল্যাটিচিউডে কুমীর থাকে না,' উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেনের ডাকে পানি থেকে উঠে এলেও কিছুতেই শান্ত হতে পারল না টপ। লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে পানির কিনারা ধরে হাঁটতে শুরু করেছে কুকুরটা। যেন পানির তলায় হেঁটে বেড়াচ্ছে কেউ, তার সঙ্গ ছাড়তে চাইছে না সে। অথচ শান্ত পানির উপরিভাগটা খুঁটিয়ে দেখেও তলার কিছু আঁচ করতে পারছে না অভিযাত্রীদের কেউ।

দারুণ বিস্মিত হয়েছেন ক্যাপ্টেনও। আধঘন্টা একনাগাড়ে টপের পেছন পেছন হেঁটে প্রসপেক্ট হাইটে এসে পৌঁছে গেলেন অভিযাত্রীরা। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টপ। হ্রদের শান্ত পানির দিকে তাকিয়ে আগের চেয়েও বেশি চেঁচামেচি শুরু করে দিল। পরক্ষণেই বিশাল একটা তিমি জাতীয় প্রাণী ভেসে উঠল পানির ওপর। কেউ

কিছু বোঝার আগেই পানিতে ঝাঁপ দিল টপ। সাঁতরাতে লাগল প্রাণীটার দিকে। বিশাল হাঁ করে টপকে গিলতে এল ওটা। কয়েক মুহূর্ত হুটোপুটি করেই টপকে নিয়ে পানিতে ডুব দিল অতিকায় জলজন্তু।

'আর ফিরবে না টপ।' বিষণ্ন বদনে বিড় বিড় করল নেব। সেও ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন। এমন সময় সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে পানির দুই ফুট ওপরে ছিটকে উঠল টপ। আশ্চর্য কাণ্ড। ভেসে উঠেই তীরের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল সে। ডাঙায় উঠতেই ওর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু, না। শরীরের কোথাও তো আঘাতের চিহ্ন নেই। দানবীয় প্রাণীর হাত ফসকে বেরিয়ে এল অথচ বিন্দুমাত্র আঁচড়ও লাগেনি গায়ে!

এতক্ষণ টপের দিকে মনোযোগ থাকায় পানির দিকে তাকায়নি কেউ। হঠাৎ সেদিকে হার্বার্টের নজর পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আরে! দেখুন, দেখুন, কি আলোড়ন উঠেছে শান্ত পানিতে। পানির নিচে মারামারি করছে নাকি কেউ?'

বিকেল গড়িয়ে গোধূলির রক্তিমাভা দেখা দিয়েছে তখন। হ্রদের পানিতেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। সহসা যেন আরও লাল হতে শুরু করল হ্রদের পানি। রক্ত, রক্ত মিশছে হ্রদের পানিতে। খানিক পরই পানির ওপর ভেসে উঠল অতিকায় প্রাণীটা। মৃত।

নিষ্প্রাণ প্রাণীটা ডাঙায় টেনে আনল অভিযাত্রীরা।

'আরে, এ যে ডুগং!' বলল হার্বার্ট।

স্থির দৃষ্টিতে ডুগংটার গলার দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। গলাটা কাটা। ধারাল অস্ত্রের আঘাতে কেটে গেছে।

'ছুরি!' সংক্ষেপে উচ্চারণ করলেন ক্যাপ্টেন।

'ছুরি!' মুখ কালো হয়ে গেল নেবের, 'ভূত আছে নাকি হ্রদের পানিতে?'

'কে জানে! দ্বীপে আসার পর থেকেই তো ভৌতিক সব কাজ কারবার ঘটে চলেছে। বেলুন থেকে পড়ে যাওয়ার পর ডুবলাম না কেন? অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে সাগর তীর থেকে গুহায় পৌঁছে দিল কে? টপকে শুকনো অবস্থায় কে পৌঁছে দিয়েছিল তোমাদের কাছে? এই মাত্র সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে কে বাঁচাল টপকে? ছুরি মেরে ডুগংটাকে হত্যা করল কে? নিজে অদৃশ্য থেকে আমাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছে, কে সে?'

চিন্তা ভারাক্রান্ত মনে সেদিন চিমনিতে ফিরে এল অভিযাত্রীরা।

৭ মে স্পিলেটকে নিয়ে প্রসপেক্ট হাইটে উঠলেন ক্যাপ্টেন। রান্নার জন্যে চিমনিতেই রইল নেব। কাঠকুটো আনতে নদীর ধারে গেল হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফট।

হ্রদের পানির দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছেন ক্যাপ্টেন। এইখানেই গতকাল মারা গিয়েছিল ডুগংটা। কি এক রহস্যকে অনুসরণ করে টপ তাঁদেরকে পথ দেখিয়ে এনেছে এখানে। হঠাৎ পানিতে একটা স্রোতের টান লক্ষ করলেন ক্যাপ্টেন। কয়েকটা পাতাসহ ছোট্ট শুকনো গাছের ডাল ওখানে ছুঁড়ে দিতেই পানির টানে ভেসে চলল ওগুলো। ওগুলোকে অনুসরণ করে চললেন দু'জনে। হ্রদের দক্ষিণ পাড়ে পৌঁছে এখানকার পানিতে ঘূর্ণিপাক দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন। হাতের লাঠি ডুবিয়ে পানির টান পরীক্ষা করতে যেতেই হাত থেকে ছুটে গেল লাঠিটা। শাঁ করে ঘূর্ণির কাছে গিয়েই টুপ করে তলিয়ে গেল সেটা। সেজদার ভঙ্গিতে বসে পড়ে মাটিতে কান পাতলেন ক্যাপ্টেন। একটু পরই হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্পষ্ট গুম গুম শব্দ শোনা যাচ্ছে। ফুটখানেক নিচেই রয়েছে সুড়ঙ্গ।'

'তা না হয় আছে। কিন্তু এরপর কি করবেন?'

'অন্য কোন পথে পানি বের করে দিয়ে শুকিয়ে নেব সুড়ঙ্গটা।'

'কিন্তু কি করে?'

'বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেব গ্র্যানাইট পাথর। হ্রদের ওই পাড়টা সাগরের দিকে থাকায় হ্রদের পানি সাগরে ঢালার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'বিস্ফোরক?' চোখ বড় হয়ে গেল স্পিলেটের, 'বিস্ফোরক মানে তো গান পাউডার। তাও জোগাড় করে নিতে হবে। ওই জিনিস দিয়ে একটা ছোটখাট গ্র্যানাইটের পাহাড় ওড়াবেন আপনি?'

'গান পাউডার দিয়ে ওড়াব কে বলল? ওড়াব শক্তিশালী বিস্ফোরক দিয়ে।'

ডুগংটার চর্বি জমিয়ে রাখলেন ক্যাপ্টেন। সামুদ্রিক গুল্ম পুড়িয়ে পাওয়া গেল সোডা সমৃদ্ধ ক্ষার। সেই সোডা দিয়ে সাবান বানাতেই চর্বি থেকে আলাদা হয়ে গেল গ্লিসারিন। প্রাকৃতিক কয়লার স্তর থেকে পাওয়া গেল খনিজ ধাতু। মন মন পাইরাইটস পুড়িয়ে পাওয়া গেল কৃস্টাল-অব সালফেট-অব-আয়রন (হীরাকষ)। আর এর থেকে তৈরি হলো সালফিউরিক অ্যাসিড। ফ্র্যাঙ্কলিন পাহাড়ের তলা থেকে খুঁজে আনা হলো সোরা। সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে সোরা মিশিয়ে তৈরি হলো নাইট্রিক অ্যাসিড। তাতে গ্লিসারিন মিশাতেই পাওয়া গেল কয়েক বোতল হলুদ রঙের তেলতেলে তরল পদার্থ।

'ব্যস, তৈরি হয়ে গেল বিস্ফোরক,' বন্ধুদের উদ্দেশে বললেন ক্যাপ্টেন। 'জানো এর নাম কি? নাইট্রোগ্লিসারিন। এ জিনিস আর একটু থাকলে পুরো দ্বীপটাকেই উড়িয়ে দেয়া যেত।'

'তাহলে ওই টুকুন তরল পদার্থ দিয়েই গ্র্যানাইটের স্তূপ গুঁড়ো করতে যাচ্ছেন আপনি?' পেনক্র্যাফটের কথায় সন্দেহের সুর।

'তাই করব। কাল ছোট্ট একটা গর্ত খুঁড়বে তুমি। মজা দেখবে তারপরই।'

পরদিন সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে লেক গ্র্যান্ট এর পূর্ব পাড়ে চলে এল পেনক্র্যাফট। সারাদিন ধরে গাঁইতি চালাল সে। মাঝে মাঝে নেব এসে সাহায্য করে গেল ওকে। বিকেলের দিকে খোঁড়া হলো গর্ত।

ভয়ঙ্কর এক্সপ্লোসিভ নাইট্রোগ্লিসারিন। আঘাত লাগলেই ফেটে যায়। গর্তটার ওপর তেরছা ভাবে তিনটে খুঁটি পোঁতা হলো। খুঁটি তিনটের মাথা একসাথে বেঁধে ট্রাইপড বানিয়ে বাঁধা জায়গা থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো একটা ভারি লোহার পিণ্ড। পিণ্ড বাঁধা দড়ির সঙ্গে আর একটা দড়ি লাগিয়ে সেটা টেনে নিয়ে যাওয়া হলো বেশ খানিকটা দূরে। শুকনো ঘাস পাকিয়ে তৈরি দড়িটায় গন্ধকের গুঁড়ো মাখানো হয়েছে আগেই। লোহার ডেলার ঠিক নিচে পাথরের গর্তে এবার ঢেলে দেয়া হলো নাইট্রোগ্লিসারিন। গন্ধক মাখানো দড়ির অন্য মাথায় আগুন ধরিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। দিয়েই সবাইকে নিয়ে ছুটলেন চিমনির দিকে। লোহার পিণ্ড ঝোলানো দড়িতে আগুন পৌঁছুতে সময় লাগবে পঁচিশ মিনিট। অবশ্য তার আগেই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেলেন অভিযাত্রীরা।

দড়ি বেয়ে আগুন গিয়ে পৌঁছল পিণ্ড বাঁধা দড়িতে। দড়ি পুড়ে নিচের নাইট্রোগ্লিসারিনের ওপর খসে পড়ল ভারি লোহার পিণ্ড। ওইটুকু আঘাতই যথেষ্ট। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে থর থর করে কেঁপে উঠল গোটা দ্বীপটা। বড় বড় পাথরের টুকরো ছিটকে পড়ল এদিক ওদিক। মাইল দুয়েক দূরে চিমনিতে বসেও বিস্ফোরণের কম্পন অনুভব করল অভিযাত্রীরা।

সব শান্ত হয়ে যেতেই হৈ হৈ করে ছুটল ওরা হ্রদের পাড়ে। বিশাল গহ্বর দিয়ে ফেনিল প্রপাতের মত বেরিয়ে যাচ্ছে হ্রদের পানি। খুশিতে আকাশ কাঁপিয়ে হুল্লোড়

করে উঠল সবাই : সেদিন একুশে মে।

পনেরো

চওড়ায় বিশ ফুট, কিন্তু উচ্চতায় মাত্র দু'ফুট গহ্বরের মুখটা। এত কম উচ্চতায় চলবে না। আপাতত নেব আর পেনক্র্যাফট গাঁইতি চালিয়ে খানিকটা বড়ো করে নিল সুড়ঙ্গ-মুখ। চকমকি আর ইস্পাত ঠুকে দুটো মশালে আগুন জ্বালানো হলো। যুগ যুগ ধরে প্রবল বেগে পানি বয়ে যাওয়া আশ্চর্য সুড়ঙ্গে একে একে প্রবেশ করল সবাই। পথ সাঁ্যাতসেঁতে পিচ্ছিল। পা পিছলে পড়ে যাবার ভয়ে একটা দড়ি কোমরের সাথে বেঁধে নিয়েছে অভিযাত্রীরা। আগে আগে চলেছে উত্তেজিত টপ।

তেমন ঢালু নয় গহ্বরের মেঝে। ক্রমশ উঁচুতে উঠে গেছে ছাদ। একটু পরই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারল ওরা। এগিয়ে চলল প্রকৃতির একান্ত গোপন এক পাথরের গুহাপথ ধরে।

হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠল টপ। আরও একটু এগোবার পর দেখা গেল সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় একটা কুয়ো। কুয়োটার পাড়ে উত্তেজিত ভাবে ছুটোছুটি করছে টপ, আর মাঝে মাঝে নিচের অন্ধকারের দিকে চেয়ে গোঁ গোঁ করে গজরাচ্ছে। যেন বলতে চাইছে, 'ওখানে কি করছিস? উঠে আয় দেখি, হয়ে যাক এক হাত।'

সবাই উঁকি মেরে দেখল কুয়োর ভেতর। কিছুই নেই। হয়তো কোন জলজন্তু ঘাপটি মেরে ছিল ওখানে। ওদের আসতে দেখে পালিয়েছে। এই কুয়ো দিয়েই হ্রদের জল সাগরে গিয়ে পড়ত—অনুমান করলেন ক্যাপ্টেন। একটা জ্বলন্ত মশাল কুয়োর ভেতর ফেলে দিলেন তিনি। জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল মশালটা। পানির সংস্পর্শে আসতেই ছ্যাঁৎ করে নিভে গেল। মশালটার নিচে পড়তে কতটা সময় লেগেছে তা দেখে নিয়ে হিসেব করে বললেন তিনি, 'কুয়োর মুখ থেকে সমুদ্র সমতল প্রায় নব্বই ফুট নিচে।'

গুহার দেয়ালে গাঁইতি দিয়ে ঠুকে দেখতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। এক জায়গায় আওয়াজটা একটু হালকা মনে হওয়ায় ওই জায়গায়ই খুঁড়তে বললেন পেনক্র্যাফটকে। সাথে সাথে কাজে লেগে গেল সে। পেনক্র্যাফট পরিশ্রান্ত হয়ে গেলে ওর জায়গা দখল করল নেব। এরপর স্পিনেলটের পালা। খুঁড়তে খুঁড়তে ছিদ্র হয়ে গেল দেয়াল। ক্রমশ বেড়ে চলল ছিদ্রের পরিধি। হঠাৎ হাত ফসকে দেয়ালের ফুটো দিয়ে ওপাশে ছিটকে পড়ল গাঁইতিটা। ক্যাপ্টেন মেপে দেখলেন তিন ফুট পুরু এখানকার দেয়াল। ফুটোটা দিয়ে আলো এসে পড়েছে গুহায়। পরিষ্কার দেখা গেল এবার গুহার ভেতরটা। এক প্রান্তে তিরিশ ফুট উঁচু গুহার ছাদ। ক্রমশ উঁচু হতে হতে প্রায় আশি ফুটে গিয়ে ঠেকেছে অন্য প্রান্তের ছাদ।

'ঘর পেয়ে গেছি আমরা,' গম্ভীর গলায় বললেন ক্যাপ্টেন, 'নিচু ছাদের তলায় হবে আমাদের ভাঁড়ার আর শোবার ঘর। উঁচু ছাদের তলায় বসার ঘর। একটা জাদুঘরও বানিয়ে নেয়া যাবে।'

'বাড়ির নাম?' জিজ্ঞেস করল হার্বার্ট।

'গ্র্যানাইট হাউস।' সাথে সাথেই উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন।

'হিপ হিপ হুররে!' সমবেত চিৎকারে প্রতিধ্বনিত হলো গুহার দেয়াল। এরপর চিমনিতে ফিরে গেল সবাই।

*

পরদিন বাইশে মে। সকাল হতেই শুরু হলো নতুন আস্তানার কাজ। চিমনি গুহাটাকে রেখে দেয়া হলো ভবিষ্যৎ কারখানার জন্যে। প্রথমে দল বেঁধে গেল সবাই সমুদ্র তীরে। স্পিলেটের হাত ফসকে ছিটকে যাওয়া গাঁইতিটা পাওয়া গেল সেখানে। ওপরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ের ফুটোটা। ঠিক হলো পাঁচটা কক্ষ করা হবে গ্র্যানাইট হাউসে। পাঁচটা ঘরের পাঁচটা জানালা। দরজা থাকবে মাত্র একটা। দরজা থেকে নিচে মাটি পর্যন্ত ঝোলানো সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকবে।

'হ্রদের দিকের ঢোকার পথটা বন্ধ করে দিতে হবে,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'নইলে অনাহূত উপদ্রব হানা দিতে পারে। সিঁড়ি বেয়ে গ্র্যানাইট হাউসে উঠে সিঁড়িটা তুলে নিলেই হবে। পাখি ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারবে না।'

'কিন্তু অত ভয় কাকে?' জানতে চাইল পেনক্র্যাফট, 'সারা দ্বীপে তো জনমানবের চিহ্নও দেখলাম না।'

'এখন নেই। কিন্তু বাইরে থেকে আসতে কতক্ষণ?'

পাথুরে দেয়াল ফুটো করে জানালা বানানোর কাজ শুরু করেই টের পেল ওরা, গাঁইতির কর্ম নয় এটা। কাজেই নাইট্রোগ্লিসারিনের সাহায্য নিতে হলো। জানালার জায়গা করার পর গাঁইতি আর শাবল দিয়ে ঠুকে ঠুকে ঠিক করে নিল জানালার অসমান ধারগুলো। পাঁচ ভাগ করা হলো গহ্বরটাকে। প্রতিটা ঘরের সামনের দিক থাকবে সাগরের দিকে। আবার তৈরি হলো ইট। সেই ইট গহ্বরে তোলার জন্যে বানানো হলো সিঁড়ি।

একাই সিঁড়ি তৈরির ভার নিল নাবিক পেনক্র্যাফট। বেত পাকিয়ে সিঁড়ির দু'পাশের ঝুল দড়ি তৈরি হলো। আড়াআড়ি ভাবে লাগানো হলো কাঠের ধাপ। সিঁড়ির দৈর্ঘ্য দাঁড়াল আশি ফুট। ওপরের পাথরের চাতালে আটকানো হলো সিঁড়ির এক মাথা। মাঝ বরাবর আটকে দেয়া হলো আরেকটা চাতালে।

গাছের ছালের দড়ি, হাতে বানানো কপিকলে আটকে হাজার হাজার ইট তোলা হলো। প্রচুর চুন দিয়ে ইট গেঁথে পার্টিশান করা হলো গহ্বরের ভেতর। রান্নাঘরের ধোঁয়া বেরোবার চিমনিও তৈরি হলো ইট দিয়ে।

এদিককার কাজ শেষ হয়ে গেলে বড় বড় পাথর গড়িয়ে নিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো হ্রদের দিকের সুড়ঙ্গ মুখ। সিমেন্ট দিয়ে একটার সাথে আরেকটা পাথরকে আটকে দিয়ে তার ওপর পুরু করে মাটির প্রলেপ লাগিয়ে ঘাসের চাপড়া দেয়া হলো। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সুড়ঙ্গের মুখ। বাকি রইল ঘরের ফার্নিচার তৈরির কাজ। ওসব শীতকালের জন্যে মুলতবী রাখা হলো।

ওদিকে স্পিলেট আর হার্বার্ট আবিষ্কার করে বসেছে এক বিশাল খরগোশের আড্ডা। ঝাঁঝরির মত অসংখ্য গর্ত মাটির ওপর। ওরা সারা জীবন খেয়ে শেষ করতে পারবে না অত খরগোশ। ঘর হলো, খাবারের সংস্থান হলো। আর চিন্তা কি? এবার আসুক শীত। আসুক মালয়ী জলদস্যু।

ষোলো

জুনের শুরুতেই শীত নামল। প্রথমেই মোমবাতির প্রয়োজন বোধ করল অভিযাত্রীরা। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আবার গোটা ছয় সীল মেরে আনল পেনক্র্যাফট। প্রথমে চুন আর চর্বি দিয়ে তৈরি হলো সাবান। সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে আলাদা করে ফেলা হলো ক্যালশিয়াম সালফেট। বাকি রইল তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড—ওলিক, মারগারিক আর স্টিয়ারিক। শেষ দুটোকে কাজে লাগিয়ে মোমবাতি বানিয়ে ফেললেন হার্ডিং, শাকসব্জির আগা পাকিয়ে হলো মোমের সলতে।

বেশি শীত পড়তে শুরু করলে গরম জামাকাপড় দরকার হবে। ভেড়ার মত লোমওয়ালা অসংখ্য মুশমন আছে ফ্র্যাঙ্কলিন হিলে। কিন্তু উলের কাপড় বোধ হয় এ শীতে আর হচ্ছে না। পরে জুতো বানাবার জন্যে সীলের চামড়া শুকিয়ে রাখা হলো। দুঃসময়ের জন্যে প্রচুর মাছ আর খরগোশ নুন দিয়ে শুকিয়ে ভাঁড়ারে মজুদ করল নেব। কয়েকটা নতুন যন্ত্র—যেমন কাঁচি, করাত তৈরি করা হলো। কাঁচি দিয়ে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল কেটে চেহারাটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করল অভিযাত্রীরা। পুরানো যন্ত্রপাতিগুলোও ঘষে মেজে সাফ করা হলো।

বিদঘুটে একটা করাতের সাহায্যে তৈরি হয়ে গেল চেয়ার, টেবিল, খাট, টুল, তাক ইত্যাদি। তৈরি হলো দুটো কাঠের পুল। গ্র্যানাইট হাউস থেকে দ্বীপের উত্তর প্রান্তে যেতে একটা ছোট্ট খাল পেরোতে হয়। একটা পুল খালের ওপর বসিয়ে দেয়া হলো। পানি ভাঙার ঝামেলা নেই বলে এবার যখন তখন যাওয়া যাবে সাগর তীরে। সাগর সৈকতে পড়ে থাকা রাশি রাশি ঝিনুক আর শামুক কুড়িয়ে এনে ভাঁড়ারে রাখল নেব-পেনক্র্যাফট। টক শরবৎ তৈরির জন্যে এক জাতের গাছের শিকড়, চিনি তৈরির জন্যে ম্যাপল গাছ, চায়ের বিকল্প হিসেবে এক প্রকার ঘাস, সবই আছে দ্বীপে। নেই শুধু রুট। সময় পেলেই ব্রেডফ্রুট জাতীয় গাছ খুঁজে বেড়ালেন ক্যাপ্টেন কয়েক দিন। হঠাৎ একটা জিনিস পেয়ে ওই গাছ আর খুঁজতে হলো না।

রিচমণ্ডে থাকাকালীন হার্বার্টকে কয়েকটা পায়রা কিনে দিয়েছিল পেনক্র্যাফট। পায়রাগুলোকে রোজ গমের দানা খাওয়াত হার্বার্ট। একটা দানা কিভাবে যেন ঢুকে গিয়েছিল ওর কোটের সেলাইয়ের ফাঁকে। ওই দানাটাই সেদিন খুঁজে পেল হার্বার্ট। আর তাই দেখেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

'রুটির অভাব তাহলে মিটল।'

'ওই একটা দানাতেই রুটি?' আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল হার্বার্ট।

'ওই দানাটাই মাটিতে পুঁতে ফেল। ওটা থেকে প্রথম বছরে পাওয়া যাবে আটশো দানা, আটশো দানা পুঁতলে দ্বিতীয় বছরে ছ'লক্ষ চল্লিশ হাজার দানা, তার পরের বছরে পুরোপুরি গমের চাষই শুরু করে দেয়া যাবে।'

গ্র্যানাইট হাউসের ছাদের এক জায়গার মাটি সাফ করা হলো। জায়গাটা কুপিয়ে নিয়ে তাতে চুন মিশিয়ে পানি ঢালা হলো। তারপর দানাটি রোপণ করে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়া হলো। দানা রোপণকে কেন্দ্র করে এক উৎসবের আয়োজন করল অভিযাত্রীরা। জাঁকজমকের সাথে অতিবাহিত হলো উৎসব। সেদিন বিশে জুন।

সবচেয়ে খুশি হলো পেটুক পেনক্র্যাফট। সেদিন থেকে নিয়মিত শস্যক্ষেত্রটি

দেখাশোনা আর আশপাশের কীট-পতঙ্গ মেরে ফেলার ভার নিল সে। জুনের শেষ নাগাদ জেঁকে নামল শীত। এত ঠাণ্ডা পড়ল যে জমে গেল হ্রদের পানি।

তবে গ্র্যানাইট হাউসের ভেতরে আরামেই রইল অভিযাত্রীরা। ঘরের ভিতরে ফায়ার প্লেসে জ্বলে গনগনে আগুন, কাজেই চিন্তা কি? সরাসরি ভাঁড়ার ঘর পর্যন্ত হ্রদের পানি টেনে আনার বন্দোবস্ত করেছিলেন ক্যাপ্টেন। ঘর গরম থাকায় বরফের তলা দিয়ে আসা পানিও জমতে পারল না।

মার্সি নদীর দক্ষিণ পাড় আর ক্লু কেপ এর মধ্যবর্তী জলাভূমিটায় যায়নি এখনও ওরা। শীতের সময় জলাভূমির পানি কমে গেল। সেটাই একদিন দেখতে যাবার সিদ্ধান্ত নিল সবাই।

সেদিন পাঁচই জুলাই। ভোর ছ'টা। সঙ্গে খাবার আর শিকারের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। আগে আগে চলল টপ। মার্সি নদীর ওই পাড়টাও ঝোপঝাড়ে ঠাসা। টপের তাড়া খেয়ে এ ঝোপ থেকে বেরিয়ে ওদিকের ঝোপে গিয়ে লুকাল কয়েকটা শেয়াল। পালাবার সময় ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া বলে চেঁচাতে চেঁচাতে গেল। ভড়কে গেল টপ। কুকুরের মতও ডাকছে কয়েকটা শিয়াল।

'ওগুলো মেরু শেয়াল,' বললেন ক্যাপ্টেন।

আরও পরে, বেলা প্রায় আটটার দিকে সাগর তীর ঘেঁষা অনুর্বর জায়গা দিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। পাহাড় নেই এদিকে। পেছনে ফিরে চাইলেন একবার ক্যাপ্টেন। প্রায় মাইল চারেক পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা।

হাঁটতে হাঁটতেই একসময় ক্যাপ্টেন বললেন, 'গড়ন আর ভূ-প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে এককালে মহাদেশেরই অংশ ছিল দ্বীপটা। হয়তো কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাগরের তলায় তলিয়ে গেছে মহাদেশ। প্রশান্ত আর আটলান্টিক মহাসাগরের প্রায় সব দ্বীপই কোন না কোন মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়।'

'তাই নাকি, ক্যাপ্টেন?' আশ্চর্য হয়ে বলল পেনক্র্যাফট, 'তাহলে তো লিঙ্কন আইল্যাণ্ডও যে-কোন সময় পানির তলায় চলে যেতে পারে।'

'অসম্ভব কিছুই নয়, তবে তার আগেই হয়তো এখান থেকে চলে যেতে পারব আমরা।'

কথা বলতে বলতে বিশাল জলাভূমিটার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। জলাটা দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল, প্রস্থে মাইল চারেক হবে। কিনারায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য আগ্নেয়শিলা। জলাটা পুরু ঘাসের চাপড়া, জলজ উদ্ভিদ, শ্যাওলা আর দুর্গন্ধময় পচা ঘাসে ঠাসা। মশার ডিপো ওটা। আর আছে অগুনতি হাঁস, টিল আর স্নাইপ। আরও যে কত জাতের পাখি আছে তার সীমাসংখ্যা নেই। মানুষ দেখেও ভয় পেল না পাখির দল। এরাও মানুষ দেখেনি তাহলে।

'ইস্! একটা বন্দুক থাকলে···।' বাকি কথাটা আঙুলের টুড়ি মেরে বুঝিয়ে দিল নাবিক পেনক্র্যাফট।

শেষ পর্যন্ত তীর ধনুক দিয়েই কয়েকটা পাখি মারা হলো। এক নজর দেখেই মন্তব্য করল হার্বার্ট, 'ট্যাডরন পাখি ওগুলো।' সেদিন থেকেই জলাটার নাম হয়ে গেল 'ট্যাডরন জোন'। রাত আটটায় ফিরে এল সবাই গ্র্যানাইট হাউসে।

শীত কাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পেল ওরা আগস্টের মাঝামাঝি। আর যদি বাতাস বইতে শুরু করে তাহলে তো কথাই নেই। হাড় ভেদ করে মজ্জায় গিয়ে ঢোকে যেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ঠাট্টা করে একদিন নেবকে বলেই ফেলল পেনক্র্যাফট, 'অন্তত একটা ভালুক পেলেও চামড়ার কোট বানিয়ে দিতে পারতাম তোমাকে।' কিন্তু ভালুক পাওয়া গেল না দ্বীপে।

প্রসপেক্ট হাইটের ওদিকের জঙ্গলে রোজ ফাঁদ পাতে পেনক্র্যাফট আর নেব। শেয়াল ছাড়া আর কিছু ফাঁদের ধারে কাছেও আসে না। দু'একটা শেয়াল মাঝে মাঝে আটকা পড়ে ফাঁদে। স্পিলেটের পরামর্শ মত মরা শেয়ালের টোপ দিয়ে ফাঁদ পাতা হতেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। একটার পর একটা পেকারি (এক জাতের শুয়োর) ধরা পড়তে লাগল ফাঁদে। কিছু খরগোশও ধরা পড়ল।

এরমাঝেই হঠাৎ একদিন আঁধার হয়ে এল আকাশ বরফ পড়া শুরু হলো। সাদা হয়ে গেল সবুজ বনভূমি। নিরুপায় হয়ে গ্র্যানাইট হাউসে আবদ্ধ থাকতে হলো অভিযাত্রীদের। অবশ্য বেকার বসে থাকল না ওরা। তক্তা কেটে আরও চেয়ার টেবিল বানিয়ে নিল। বেত পাকিয়ে ঝুড়ি বানাল। ম্যাপলের রস জাল দিয়ে হলো প্রচুর মিছরি

বরফ পড়া থামল আগস্টের শেষ নাগাদ। লিঙ্কন দ্বীপকে আর চেনা যাচ্ছে না এখন। যেদিকে চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ।

গ্র্যানাইট হাউস থেকে বেরিয়ে এল অভিযাত্রীরা। প্রথমেই গেল ফাঁদের কাছে। নখযুক্ত থাবার চিহ্ন দেখা গেল ফাঁদের আশেপাশে। বেড়াল গোষ্ঠীর চতুষ্পদ প্রাণী। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হয়তো পশ্চিমের বন ছেড়ে চলে এসেছে। চিন্তিত হলো ওরা।

কয়েকদিন পর আবার বরফ পড়া শুরু হলো। আবার গ্র্যানাইট হাউসে আটকে থাকতে হলো ওদের। একটা অবাক কাণ্ড ঘটতে দেখা গেল এসময়। মাঝে মাঝে কুয়োটার কাছে ছুটে গিয়ে গজরায় টপ।

'মনে হয় কোন জলজন্তু এসে আশ্রয় নেয় কুয়োর তলায়।' কুকুরটার রকম সকম দেখে বললেন ক্যাপ্টেন।

এর কিছুদিন পরই এমন একটা ঘটনা ঘটল যে রীতিমত শঙ্কিত হলো অভিযাত্রীরা। সেদিন ছাব্বিশে অক্টোবর। শীত কমে যাওয়ায় বরফ গলতে শুরু করেছে। একটা বেশ বড়সড় পেকারি-সাথে একটা কয়েক মাসের বাচ্চা সহ ফাঁদে আটকা পড়েছে। তাই দেখে দারুণ খুশি পেনক্র্যাফট। যত্ন করে রাঁধতে বসে গেল সে। সেদিন খাবার টেবিলে এল বাচ্চা পেকারির রোস্ট, ক্যাঙ্গারুর ঝোল, শুয়োরের গোশত, সোনপাইন বাদাম আর ওসবেগো ঘাসের চা। বাচ্চা পেকারিটার একটা অংশ কেটে নিয়ে মুখে পুরল পেনক্র্যাফট। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠে হাত চাপা দিল মুখে।

'হলো কি? অ্যাঁ, কি হলো তোমার?' উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

'একটা দাঁতই শেষ হয়ে গেছে।'

'দাঁত গেছে? মানে ভেঙেছে? পেকারির গোশতে পাথর ছিল নাকি?'

মুখ থেকে শক্ত জিনিসটা বের করে টেবিলে রাখল পেনক্র্যাফট। পাথর না জিনিসটা, সীসার টুকরো। চেপ্টে যাওয়া একটা বুলেটের অংশ।

সতেরো

যেন ভূত দেখছে এমন ভাবে গুলিটার দিকে চেয়ে রইল সবাই।

'পেকারির বাচ্চাটার বয়স কত ছিল, পেনক্র্যাফট?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'মাস তিনেক। ফাঁদে আটকেও মায়ের দুধ খাচ্ছিল।'

'তিন মাসের মধ্যেই কেউ গুলিটা ছুঁড়েছে। যেই ছুঁড়ে থাকুক সে হয়তো

এখনও এ দ্বীপেই আছে। কাজেই হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের।'

'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন, একটা ছোট্ট নৌকো বানিয়ে নিলে কেমন হয়? তাহলে জলপথে ঘুরে দেখা যাবে দ্বীপটা।'

'খুব ভাল হয়। ক'দিন লাগবে বানাতে?'

'বড়জোর দিন পাঁচেক।'

'ঠিক আছে। কাল থেকেই নৌকো তৈরির কাজ শুরু করে দাও।'

এর ঠিক দু'দিন পর, আটাশে অক্টোবর ঘটল আরও একটা ঘটনা। গ্র্যানাইট হাউস থেকে মাইল দুয়েক দূরে সাগরের ধার দিয়ে হাঁটছিল পেনক্র্যাফট আর নেব। হঠাৎ দেখল ওরা, পাথরের আনাচে কানাচে পথ করে নিয়ে গুটি গুটি করে হেঁটে যাচ্ছে একটা বিশাল কচ্ছপ। সাথে সাথেই ছুটে গিয়ে কচ্ছপটাকে উল্টে দিল পেনক্র্যাফট। উল্টে দিলে পালানো সম্ভব নয় কচ্ছপের পক্ষে, তবু ওটার চারপাশে পাথরের ঠেকা দিয়ে রাখল আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। এতবড় কচ্ছপটা দু'জন বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই গ্র্যানাইট হাউসে গিয়ে ঠেলা গাড়ি নিয়ে এল। এসেই থ। ঠেকা দেয়া পাথরগুলো তেমনি আছে, নেই শুধু কচ্ছপটা। সব শুনে ভাবনায় পড়লেন ক্যাপ্টেন।

ঠিক পাঁচ দিনের মাথায় তৈরি হয়ে গেল নৌকো। হালকা কাঠ আর গাছের ছাল দিয়ে তৈরি হলো ওটা। বারো ফুট লম্বা নৌকোটার ওজন হবে আড়াই মনের মত। সেদিনই নৌকোয় উঠে বসল সবাই।

'দেখো, দেখো, পেনক্র্যাফট, চুঁইয়ে চুঁইয়ে পানি উঠছে নৌকোয়!' একটু ভয় পেল যেন হার্বার্ট।

'ও কিচ্ছু না, নতুন নৌকো তো, দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।'

তীর থেকে আধমাইলটাক দূরে সরে গিয়ে নৌকো বাইতে লাগল পেনক্র্যাফট। এখান থেকে ফ্র্যাঙ্কলিন হিলকে সুন্দর দেখাচ্ছে। নৌকোয় চড়ে ঘুরতে ঘুরতে বুঝতে পারলেন স্পিলেট, তটভূমির অনেক কিছুই অদেখা ছিল ওদের। ঘণ্টাখানেক পর প্রবল বিস্ময়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হার্বার্ট, 'আরে, ওটা কি? ওই, ও-ই-ই যে?' আঙুল তুলে তীরের দিকে দেখাল সে।

হার্বার্টের নির্দেশিত দিকে চাইল সবাই। বিশাল দুটো পিপের মাঝখানে একটা সিন্দুক পড়ে আছে বেলাভূমিতে। তাড়াতাড়ি তীরে ভিড়ানো হলো নৌকো। বালির মাঝে সিন্দুকটা প্রায় গেড়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। নিশ্চয়ই ভারি কিছুতে ঠাসা ওটা। আশেপাশে জাহাজডুবি হলো নাকি?

সিন্দুকটার তলা ভাঙতে গেল পেনক্র্যাফট, কিন্তু বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন। এখানে ভাঙা ঠিক হবে না। কাজেই পিপেসহ সিন্দুকটা জোয়ারের পানিতে ভাসিয়ে নৌকোর পেছনে বেঁধে টেনে আনা হলো গ্র্যানাইট হাউসে। তারপর হার্বার্ট আর নেব ছুটে গিয়ে উঠল একটা বড় গাছের মগডালে। যদ্দূর চোখ যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে দেখল দু'জনে। কিন্তু জাহাজ তো দূরের কথা, একটা ভাঙা মাস্তুলও চোখে পড়ল না।

যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতি সাবধানে বাক্সটা খুলল পেনক্র্যাফট। খুলেই চক্ষুস্থির। এ কি করে সম্ভব? আরব্য উপন্যাসের দেশে হাজির হয়েছে নাকি ওরা? দস্তার পাত দিয়ে মোড়া সিন্দুকের ভেতরটা জামাকাপড়, বই, রান্নার সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র আর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। বেঁচে থাকতে হলে কয়েকজন সভ্য মানুষের যা যা দরকার তার সবই আছে ওতে।

ক্যাপ্টেনের জন্যে কাঁটা কম্পাস, দূরবীন, সেক্সট্যান্ট, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার থেকে শুরু করে নেবের জন্যে সসপ্যান, থালাবাসন, স্টোভ, কেটলী,

ছুরি আর স্পিলেটের জন্যে বন্দুক, বুলেট, বারুদ, ছররা, ডেজালিও পাওয়া গেল। আর আছে জামাকাপড়, অভিধান, বাইবেল, বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানের বই, সাদা কাগজ, ডায়েরী। এমন কি একটা ক্যামেরা ও ফটো তোলার যাবতীয় সরঞ্জামও আছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আশ্চর্য হলেন ক্যাপ্টেন—এত জিনিসের কোনটার গায়েই লেখা নেই ওগুলো কোন্ দেশের তৈরি।

খুশিতে ধেই ধেই নাচতে ইচ্ছে করছে ওদের, শুধু পেনক্র্যাফট ছাড়া। মুখ গোমড়া করে বলল সে, 'সবই পাইয়ে দিল আরব্য উপন্যাসের ভূত, সিন্দুকের ভেতর একটু তামাক পুরে দিলে কি ক্ষতি ছিল?' ওর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

রাতের খাওয়ার পর বাইবেলটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন ক্যাপ্টেন, এমন সময় পেনক্র্যাফট বলল, 'একটা কুসংস্কারে বিশ্বাসী আমি, ক্যাপ্টেন। বাইবেলটার বাঁধাইয়ের দিক টেবিলে খাড়া অবস্থায় রেখে হাত সরিয়ে আনুন। বাইবেলের যে জায়গাটা আগে খুলবে, হয়তো সেখানে আমাদের এ পরিস্থিতিতে কি করা উচিত তার নির্দেশ পেয়ে যাবেন।'

কথাটা হাস্যকর হলেও কি মনে করে তাই করলেন ক্যাপ্টেন। আস্তে করে দু'ভাগ হয়ে টেবিলে বিছিয়ে পড়ল বাইবেলের দু'দিক। কে যেন একটা সরু কাঠি গুঁজে রেখেছিল বাইবেলের ওই পাতা দুটোর মাঝখানে। সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের পাশে লাল পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করা রয়েছে। জোরে জোরে চিহ্নিত জায়গাটা সবাইকে পড়ে শোনালেন ক্যাপ্টেন, 'ঈশ্বরের কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। যে খুঁজবে, তাঁকে, সে-ই পাবে।'

আঠারো

পরদিন ভোরে, জাহাজডুবি হয়ে সত্যিই কেউ দ্বীপে উঠেছে কিনা দেখার জন্যে নৌকোয় চেপে রওনা দিল অভিযাত্রীরা। জোয়ার এসেছে তখন মার্সি নদীতে। মাঝ নদীতে নৌকোটা নিয়ে গিয়ে হাল ধরে বসে রইল পেনক্র্যাফট। জোয়ারের টানে আপনি ভেসে চলল নৌকো।

একজায়গায় তীরের খুব কাছাকাছি চলছিল নৌকো। ওই সময়েই রাই সরষের গাছ খুঁজে পেল হার্বার্ট। দেখে রেগে গেল পেনক্র্যাফট। 'সবই পাওয়া যাচ্ছে এই দ্বীপে, শুধু শালার তামাক গাছ ছাড়া,' বিড় বিড় করে বলল সে।

অনেকক্ষণ পর দেখা গেল ফাঁকা হয়ে আসছে গাছপালা। এখানে অত্যন্ত লম্বা, প্রায় একশো ফুটের কাছাকাছি, এক জাতের গাছ দেখা গেল।

'ওগুলো ইউক্যালিপটাস,' বলল হার্বার্ট।

'এ গাছকে অস্ট্রেলিয়ায় কি বলে জানো?' প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

'না তো।'

'ফিভার ট্রি।'

'সেরেছে, জ্বর হয় নাকি এ গাছের?'

'হয় না, তবে পালায়। অর্থাৎ যেখানে এ গাছ থাকে সেখান থেকে পালায় জ্বর। এর হাওয়া লাগলেও জ্বর সেরে যায়।'

নদীর দু'তীরে শুধু আকাশ-ছোঁয়া ইউক্যালিপটাস। আরও মাইল দুয়েক এগোবার পর নদীর গভীরতা কমতে শুরু করল। গাছের ডালে লাফালাফি করছে

অসংখ্য বানর। আরও কিছুটা যাওয়ার পর নৌকোর তলা মাটিতে ঠেকে গেল আর এগোবে না নৌকো। টেনে নৌকোটাকে তীরে তুলে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে রাখল পেনক্র্যাফট।

অপূর্ব সুন্দর জায়গাটা। গাছে ছাওয়া নির্জন বুনো এলাকা। ঠিক হলো এখানেই রাত কাটাবে অভিযাত্রীরা। রান্নার আয়োজন করা হলো। সকাল সকাল সেরে ফেলল ওরা রাতের খাওয়া। মশাল জ্বালিয়ে পাহারায় রইল নেব আর হার্বার্ট। নির্বিঘ্নে কেটে গেল রাতটা।

পরদিন ভোরে নাস্তা সেরে নিয়ে রওনা দিল সবাই। লতাপাতা, ঝোপঝাড় কেটে, লম্বা ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে চলল ওরা। উর্বর জমি আর ঘন জঙ্গল এদিকটায়।

সকাল সাড়ে ন'টায় বিশাল এক ঝর্নার ধারে পৌঁছাল অভিযাত্রীরা। ঝর্নাটা পেরোনোই এক সমস্যা। হঠাৎ কি দেখে হাঁটু পানিতে নেমে গেল পেনক্র্যাফট। পানিতে হাত ডুবিয়ে একটার পর একটা তুলতে থাকল গলদা চিংড়ি। পাঁচ মিনিটেই ভরে ফেলল বড়সড় এক থলে। ওগুলো দেখে খুশিতে আত্মহারা নেব কিন্তু যতই নতুন নতুন জিনিসের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে ততই বিমর্ষ হয়ে পড়ছে পেনক্র্যাফট। হতচ্ছাড়া এই দ্বীপে সবই আছে, নেই শুধু ওর তামাক।

ঝর্নাটা পেরোতে হলো না। ওটার তীর ধরে আধঘণ্টা মত হাঁটতেই সাগর দেখা গেল। দ্বীপের পূর্ব তীর পাথুরে অথচ পশ্চিম তীরে দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল। সাগর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেচে বনভূমি। দূর থেকে মনে হয় সবুজ লাইনিং দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে নীল সাগর। মাইল দুয়েক এভাবে গিয়ে বিরল হয়ে এসেছে গাছপালা। এরপর বহুদূর এগিয়ে গেছে তীরভূমি।

'এতটা এসেও তো জাহাজডুবির কোন চিহ্ন পেলাম না!' বলল হার্বার্ট, 'সত্যিই কি আছে কেউ দ্বীপে?'

'চিহ্ন সত্যিই পেলাম না,' উত্তর দিলেন স্পিলেট, 'কিন্তু দ্বীপে যদি কেউ নাই থাকে, পেকারির বাচ্চাটাকে গুলি করল কে?'

একটু থেমে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার শুরু হলো চলা। অন্তত সার্পেন্টাইন পেনিনসুলার শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে। পাঁচটা পর্যন্ত হেঁটেও পৌঁছানো গেল না জায়গামত। রাত কাটাবার জন্যে একটা জায়গা খুঁজতে গিয়ে বাঁশঝাড়টা চোখে পড়ল হার্বার্টের। উৎসুক ভাবে ওকে বাঁশঝাড়ের দিকে চাইতে দেখে জিজ্ঞেস করল পেনক্র্যাফট, 'বাঁশ দিয়ে কি হবে?'

'কি হবে? ঝুড়ি হবে, ঘরের বেড়া হবে। চাই কি ভারতীয়দের মত বাঁশের কোড় খাওয়াও যেতে পারে।'

তীরের কাছেই, ঢেউয়ের আঘাতে পাহাড়ের গায়ে সৃষ্টি হয়েছে একটা গহ্বর। ওর ভেতরই থাকা যায় কিনা দেখার জন্যে ভেতরে ঢুকতে গেল হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফট। সাথে সাথে গুহার ভেতর থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ গর্জন। এক লাফে হার্বার্টকে নিয়ে একটা পাথরের আড়ালে লুকাল পেনক্র্যাফট।

গর্জনটা স্পিলেটও শুনেছেন। আওয়াজ শুনে মনে হলো কোন বড় জানোয়ার। বন্দুক হাতে ছুটে এলেন তিনি। আরেকবার কলজে কাঁপানো ডাক ছেড়ে গুহার মুখে বেরিয়ে এল একটা জানোয়ার। বিশাল বুনো বেড়ালের মত জানোয়ারটার হলদে গায়ে কালো ছোপ। জাগুয়ার।

বন্দুক তুলে গুলি করলেন স্পিলেট। দু'চাখের ঠিক মাঝখানে লাগল গুলি। সেখানেই গড়িয়ে পড়ল জাগুয়ারটা। চামড়াটা দেখে দারুণ খুশি হলো নেব। সাথে সাথেই জাগুয়ারের চামড়া ছাড়াতে বসে গেল সে।

গুহার ভেতর জাগুয়ারের উচ্ছিষ্ট বহু হাড় পাওয়া গেল। দেখে শুনে মনে হলো মাত্র একটা জানোয়ারই ছিল গুহাটায়। মধ্য এশিয়ার তাতারদের জীবন যাত্রার অনেক খুঁটিনাটিই তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখে গেছেন মার্কোপোলো। কথাটা সেখানেই পড়েছিলেন ক্যাপ্টেন। গাঁট শুদ্ধ বাঁশের টুকরো আগুনে ফেলে দিলে নাকি প্রচণ্ড শব্দ করে ফাটে। বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে এনে তাই করলেন ক্যাপ্টেন। সত্যিই, বন্দুকের আওয়াজের মত শব্দ করে ফাটতে শুরু করল বাঁশের গাঁট. সে আওয়াজে শুধু বুনো জন্তু কেন ভূত প্রেতও বোধহয় ত্রিসীমানা থেকে পালাবে এভাবে বেশ কিছু বাঁশের গাঁট ফাটিয়ে, জন্তু জানোয়ারদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে সে রাতটা গুহাতেই কাটাল সবাই। ভোর পর্যন্ত একটানা জ্বলতে থাকল গুহার মুখে পুঁতে দেয়া কাঠের মস্ত মশাল।

উনিশ

পরদিন, পহেলা নভেম্বর সকাল থেকেই দ্বীপের দক্ষিণ তীর ঘেঁষে চলা শুরু হলো। ঠিক হলো, দক্ষিণ তীরে জাহাজডুবির চিহ্ন খুঁজে রাতের আগেই মার্সি নদী পেরিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে পৌছতে হবে। নৌকোটা যেখানে আছে সেখানেই থাকুক দিন কয়েক।

'নৌকোটা নিরাপদেই থাকবে ওখানে, কি বলো?' পেনক্র্যাফটকে উদ্দেশ করে বললেন স্পিলেট।

'কি করে বলি,' বলল পেনক্র্যাফট, 'কচ্ছপের ঘটনাটা মনে নেই?'

'আসলে জোয়ারের পানিতে, উল্টে গিয়ে ভেগেছিল কচ্ছপটা।'

'আমার তা মনে হয় না,' স্বগতোক্তি করলেন ক্যাপ্টেন, 'অতদূরে জোয়ারের পানি আসতে পারে না।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু অত ঘুরে গ্র্যানাইট হাউসে পৌছতে হলে নদী পেরোব কি করে?' জিজ্ঞেস করল নেব

'শুধু কয়েক টান তামাক খেয়ে নিতে পারলে ও নদী সাঁতরেই পেরিয়ে যেতে পারতাম আমি,' বলল পেনক্র্যাফট।

প্রায় কুড়ি মাইল পথ পেরিয়ে আসার পরও জাহাজডুবির কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। দুপুর হয়ে গেছে তখন. খাওয়াটা সেরে নিয়ে আবার চলা শুরু হলো। তিনটে নাগাদ একটা শান্ত হ্রদের কাছে পৌছল ওরা। প্রণালীর আকারে সরু হয়ে এসে হ্রদে পড়েছে সাগরের পানি। চারদিকে পাহাড় ঘেরা ঠিক যেন একটা ছোট্ট নিরিবিলি বন্দর। টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে হ্রদের বহু দূর পর্যন্ত দেখলেন ক্যাপ্টেন। দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেল চোখ। কিন্তু ভাঙা জাহাজ বা জীবন্ত মানুষের কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। নিশ্চিন্ত হলেন সকলে। পেকারিটাকে যে-ই গুলি করুক না কেন, সে আর এখন এ দ্বীপে নেই। চলে গেছে দ্বীপ ছেড়ে।

এমন সময় বনের ভেতর কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। চমকে উঠে চারদিকে চাইল সবাই। টপ নেই। তবে কি ওই চেঁচাচ্ছে? দৌড়ে বনের ভেতর গিয়ে ঢুকল ওরা। টপই ডাকছে। মুখে একটা কাপড়ের টুকরো। একটা দেবদারু গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে টপ ওদের দেখে কাপড়ের টুকরোটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে উপরের দিকে চেয়ে আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠল। টপের দৃষ্টি অনুসরণ করে উপরের দিকে চাইল সবাই পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট, 'ওই তো,

ওই তো জাহাজডুবির চিহ্ন।'

বিরাট একটা সাদা কাপড় ঝুলছে গাছের মাথায়। ওরই অংশ হয়তো ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে ছিল। তাই কুড়িয়ে পেয়েছে টপ।

'ওটা জাহাজের পাল নয়, পেনক্র্যাফট,' বলল স্পিলেট, 'ওটা আমাদের বেলুনের ধ্বংসাবশেষ।'

বেলুনটা দেখে খুশি হলো সবাই। সবার জন্যেই পোশাক বানানো যাবে ওটা দিয়ে। তর তর করে গাছে উঠে গেল হার্বার্ট, পেনক্র্যাফট আর নেব। ঘন্টা দুয়েক পরিশ্রমের পর দড়িদড়ার জট ছাড়িয়ে প্রায় আস্ত বেলুনটাই মাটিতে নামানো হলো।

'জীবনে আর কোনদিন বেলুনে চড়ছি না। ওটা দিয়ে পাল বানাব আমি, একটা বড় নৌকোর পাল,' বলল পেনক্র্যাফট।

অতবড় বেলুনটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই পাহাড়ের গুহায় একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দেয়া হলো ওটা। পরে এসে নিয়ে যাওয়া যাবে। এতসব করতে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আজ আর গ্র্যানাইট হাউসের বাইরে রাত কাটাবে না ভেবে রওনা দিল অভিযাত্রীরা। যাবার আগে জায়গাটার নাম দিয়ে গেল, 'পোর্ট বেলুন।'

সিন্দুকটা যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেই জায়গাটার নাম রাখা হয়েছিল 'ফ্লোটসাম পয়েন্ট'। ওখানটায় যখন পৌঁছল ওরা, দিনের আলো নিভে গিয়ে আঁধার নেমেছে তখন দ্বীপের বুকে। মার্সি নদীর প্রথম বাঁকটার কাছে পৌঁছতে প্রায় এগারোটা বেজে গেল। প্রায় আশি ফুট চওড়া এখানে নদী। কাছে এসেই ফিস ফিস করে বলল হার্বার্ট, 'কি যেন ভাসছে পানিতে।'

'তাই তো,' ফিস ফিস করে শব্দটা উচ্চারণ করেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট, 'আরে ওটা তো আমাদের নৌকোটা! এখানে এল কি করে?'

সম্পূর্ণ ভূতুড়ে কাণ্ড! নৌকোটাকে কাছে টেনে আনার পর দড়ি পরীক্ষা করে দেখলেন ক্যাপ্টেন। মনে হলো পাথরে ঘষা খেয়ে ছিঁড়ে গেছে দড়ি।

নৌকোয় করেই নদীটা পার হলো সবাই। যদিও ভেলা বানিয়ে নদী পার হতে হবে ভেবে রেখেছিল ওরা, কিন্তু রহস্যময় এই ঘটনাটা সবার মন ভার করে রাখল।

চিমনির কাছে নৌকোটাকে তুলে রেখে গ্র্যানাইট হাউসের দিকে চলতে শুরু করল ওরা। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই আবার চেঁচাতে শুরু করল টপ। টপের চেঁচানোর কারণ বোঝা গেল আরও একটু এগোবার পর। যাবার সময় গ্র্যানাইট হাউসে ওঠার ঝুলন্ত সিঁড়িটা যথাস্থনে ঝুলিয়ে রেখে গেছে ওরা। এখন আর নেই সিঁড়িটা।

অন্ধকারে ভালমত দেখা যাচ্ছে না। আশেপাশে পড়ে যায়নি তো? মশাল জ্বেলে অনেক খোঁজা হলো, কিন্তু পাওয়া গেল না সিঁড়ি। একেবারে গায়েব!

'পেকারিটাকে গুলি করেছিলেন যিনি সেই হারামখোর ভদ্রলোকই আমাদের বাড়ি দখল করেছেন হয়তো?' ক্ষোভে বুজে এল স্পিলেটের গলার স্বর।

গালাগালি শুরু করে দিল পেনক্র্যাফট। একবার মনে হলো হালকা গলায় কে যেন হেসে উঠল গ্র্যানাইট হাউসের ভেতর। নিরুপায় হয়ে সে রাতটা চিমনিতে কাটাল সবাই। সারারাত গ্র্যানাইট হাউসের সামনে পাহারায় থাকল টপ।

ভোর হতেই ছুটে এল ওরা গ্র্যানাইট হাউসের কাছে। সিঁড়ির ওপরের অংশটা যেমন ঝুলছিল তেমনি আছে। নিচের অংশটা কেউ তুলে রেখেছে চাতালে। জানালাগুলো বন্ধই আছে, তবে দরজাটা খোলা।

একটা বুদ্ধি এল হার্বার্টের মাথায়। দড়ির মাথায় তীর বেঁধে সিঁড়ির নিচের ধাপ

লক্ষ্য করে ছুঁড়ল সে। বার কয়েক চেষ্টার পর সিঁড়ির ধাপ গলে নিচের দিকে পড়ল তীরটা। এবার নিচের অংশ ঢিল দিলেই সড় সড় করে নেমে আসবে তীর বাঁধা দড়ির মাথা। দুটো মাথা এক সাথে হয়ে গেলেই টেনে নামিয়ে নেয়া যাবে সিঁড়ি। তাই করতে যাবে ওরা, এমন সময় দরজা দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে এল একটা হাত। একটানে আরও ওপরে তুলে নিল সিঁড়িটা। তীরটা খুলে নিয়ে নিচে ছুঁড়ে দিল।

সাথে সাথেই প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট, 'গুলি করে খুলি ফুটো করে দেব, শুয়োরের বাচ্চা।'

'কাকে গুলি করবে?' জিজ্ঞেস করল নেব।

'ওই হারামজাদাটাকে। দেখলে না হাতটা?'

'ওটা মানুষের হাত না।'

'অ্যাঁ, তাইতো!' হঠাৎ মনে হলো পেনক্র্যাফটের, মিশমিশে কালো লোমশ হাতটা মানুষের হতে পারে না। মিন মিন করে জিজ্ঞেস করল, 'কি ওটা?'

'যদ্দূর মনে হয় ওরাং ওটাং; মানে শিম্পাঞ্জী।'

হঠাৎ এক ঝটকায় খুলে গেল দুটো জানালা। এক সাথে উঁকি মারল বেশ ক'টা মুখ। দাঁত ভেংচাতে শুরু করল অভিযাত্রীদের দিকে চেয়ে। ওরাং ওটাংই।

এক আজব লড়াই শুরু হলো ওরাং ওটাং আর মানুষের মধ্যে আবার তীর বাঁধা দড়িটা ছুঁড়ল হার্বার্ট। সিঁড়ির ওপরের ধাপ দিয়ে গলে গেল তীরটা। দ্রুত হাতে ওই মাথাটা নামিয়ে আনল সে। এবার দড়ির মাথা দুটো ধরে নিচের দিকে টানতে লাগল সবাই মিলে। নেমে যাচ্ছে দেখে সিঁড়ির ওপরের অংশ ধরে টেনে রাখল শিম্পাঞ্জীর দল। টানাটানিতে পট করে ছিঁড়ে গেল দড়ি। উপায়ান্তর না দেখে গুলি চালানো শুরু করল ওরা এবার। গুলি খেয়ে নিচে পড়ে গেল একটা জানোয়ার। বুঝে গেল ওরা গুলি কি জিনিস। চকিতে ঘরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল শিম্পাঞ্জীর দল।

গ্র্যানাইট হাউসের কাছ থেকে সরে গেল অভিযাত্রীরা। লুকিয়ে রইল পাথরের আড়ালে। উদ্দেশ্য—শিম্পাঞ্জীরা ভাববে হতাশ হয়ে চলে গেছে ঘরের মালিকরা, কাজেই বেরিয়ে আসবে বাইরে। কিন্তু অত বোকা না মানুষের পূর্ব পুরুষ। সমগোত্রেরই গরিলাদের মতন চট করে রাগে না ওরা। বেবুনদের মত গর্দভও না। ওদের ধৈর্যের কাছে হার মানতে হলো অভিযাত্রীদের।

বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল অভিযাত্রীরা। গাঁইতি শাবল দিয়ে হ্রদের দিকের সুড়ঙ্গ মুখ ভেঙেই ঢুকতে হবে ভেতরে। সেদিকে রওনা হতে যাবে এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল টপ।

টপের ডাকে উপরের দিকে চাইল অভিযাত্রীরা। আশ্চর্য! হঠাৎ কেন যেন ভয় পেয়ে গেছে ওরাং ওটাংয়ের দল। এ জানালা ও জানালায় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে ওগুলো। সুযোগ পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করল অভিযাত্রীরা। কয়েকটা ওরাং ওটাং নিচে পড়ে যেতেই বাকিগুলো বেরিয়ে এসে ছুট লাগাল। অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে।

আরও বিস্ময় বাকি ছিল তখনও। ওরাং ওটাংগুলো চলে যেতেই সড়াৎ করে নিচে এসে পড়ল সিঁড়িটা। মনে হলো কেউ যেন নিচে ঠেলে ফেলে দিল ওটা।

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল সবাই। উঠেই থমকে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা ওরাং ওটাং। ভেতরের দিকে কোথাও হয়তো বসেছিল এতক্ষণ। বেরিয়ে যাবার সময় পায়নি। কুড়াল হাতে ছুটে গেল নেব। খুনই করে ফেলবে সে জানোয়ারটাকে। বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন, 'মের না ওটাকে, নেব।

পোষ মানিয়ে ট্রেনিং দিয়ে কাজে লাগাতে পারব।'

কিন্তু ওটাকে কাবু করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো। বহু চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ছ'ফুট লম্বা সাঙ্ঘাতিক শক্তিশালী প্রাণীটাকে ধরে ফেলল অভিযাত্রীরা। ওরাং ওটাংটার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা হলো দড়ি দিয়ে।

'ওর একটা নাম রেখে দিলেই তো হয়,' বলল পেনক্র্যাফট, 'কি নাম রাখা যায় ওর, অ্যাঁ? জাপ রাখা যাক কি বলেন, ক্যাপ্টেন? মাস্টার জাপ?'

সম্মতি জানাল সবাই।

কুড়ি

একটু দূরে জঙ্গলের ধারে ওরাং ওটাং এর লাশগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলা হলো। সহজেই পোষ মানিয়ে ফেলা গেল জাপকে। কখনও বেয়াড়াপনা না করে যা শেখানো হয় চুপচাপ শিখে নেবার চেষ্টা করে।

এবার কয়েকটা কঠিন কাজে হাত দিল অভিযাত্রীরা। একটা ব্রিজ তৈরি করে ফেলল মার্সি নদীর ওপর। ব্রিজের মাঝখানটা ইচ্ছে করলে খুলে রাখা যায়। এতে দ্বীপের দক্ষিণ দিকে যাতায়াতের বেশ সুবিধে হয়ে গেল।

মার্সি নদী আর লেক গ্র্যান্টের মাঝামাঝি একটা পরিখাও খুঁড়ে ফেলল ওরা। নাইট্রোগ্লিসারিন দিয়ে গ্র্যানাইট পাথর উড়িয়ে দেবার পর সহজেই খোঁড়া গেল পরিখা। পরিখার নাম রাখা হলো ক্রীক গ্লিসারিন। এবার চারদিক থেকেই সুরক্ষিত হয়ে গেল গ্র্যানাইট হাউস। রেড ক্রীকের কাছাকাছি একটা খোঁয়াড়ও তৈরি করে ফেলল ওরা। মার্সি নদীর ওপারের পাহাড় থেকে মুশমন আর অন্যান্য লোমশ জন্তু ধরে এনে আটকে রাখতে হবে খোঁয়াড়ে। এদের লোম দিয়ে তৈরি হবে শীতকালের জন্যে গরম সোয়েটার।

গ্র্যানাইট হাউসের কাছেই তৈরি হলো পোলট্রি ফার্ম। কাঠ দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট খোপ তৈরি করা হলো পাখি পোষার জন্যে। পোলট্রির প্রথম বাসিন্দা হলো দুটো টিনামু পাখি। এরপর এল ছয়টা হাঁস। পেলিক্যান, মাছরাঙা, জল মোরগ আর বুনো পায়রাদেরকে ধরে আনতে হলো না। আপনা আপনি এসে বাসা বাঁধল কাঠের খোপে।

শাকসব্জি আর ফসলের চাষ হবে প্রসপেক্ট হাইটে। শক্ত কাঠের বেড়া দিয়ে দেয়া হলো খেতের চারদিকে। হাস্যকর চেহারার একটা কাকতাড়ুয়া পুতুল বানিয়ে খেতের মাঝখানে পুঁতে দিল পেনক্র্যাফট। এসব কাজে প্রচুর সাহায্য করেছে জাপ। ট্রেনিং শেষে ছেড়ে দেয়ার পর পালাবার চেষ্টা করেনি সে। ভারি ভারি জিনিস বয়ে আনা থেকে শুরু করে ওর পক্ষে যা যা করা সম্ভব সবই করছে সে।

পোর্ট বেলুন থেকে বিশাল বেলুনটাকে নিয়ে আসা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। একটা ঠেলা গাড়ি না হয় বানিয়ে নেয়া যায়, কিন্তু ওটা টানবে কিসে? গরু-ঘোড়া কিছুই তো নেই ওদের। হঠাৎ অলৌকিক ভাবেই যেন সমাধান হয়ে গেল সমস্যার। সেদিন ২৩ ডিসেম্বর। হঠাৎ ভীষণ চেঁচামেচি জুড়ে দিল টপ। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অভিযাত্রীরা হতবাক। মার্সি নদীর পুল পার হয়ে ওপারের জঙ্গল থেকে এসে ওদের এলাকায় ঢুকে পড়েছে দুটো চতুষ্পদ জানোয়ার। ওনাগা। এক জাতের ঘোড়া আর জেব্রার সংমিশ্রণ। ধোঁয়াটে শরীর, মাথায় কালো ডোরা, সাদা লেজ আর পা নিয়ে অপূর্ব সুন্দর প্রাণী দুটো।

ওগুলোকে দেখেই চিনল হার্বার্ট, 'ওনাগা! ওনাগা!'

'ওনাগা? গাধা বললেই হয়,' বলল নেব।

'গাধা বলবে কি করে? কান দুটো দেখছ না? গাধার মত লম্বা না ওগুলো, চেহারাটাও বিশ্রী না।'

প্রাণী গবেষণার ধার দিয়েও গেল না পেনক্র্যাফট। বলল, 'ওনাগা হোক আর গাধাগা হোক কিছুই এসে যায় না। ওদেরকে দিয়েই গাড়ি টানাব।' বলেই আর দাঁড়াল না সে। লম্বা ঘাসের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল ব্রিজের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল। দৌড়ে গিয়ে মাঝের অংশটা খুলে ফেলল। চতুর্দিক পানিবেষ্টিত অঞ্চলে বন্দী হলো ওনাগা দুটো। ঘাসের অভাব নেই এখানে। এখন ওদেরকে বিরক্ত না করে আস্তে আস্তে পোষ মানিয়ে নেয়া যাবে।

পোলট্রির কাছেই তৈরি হলো আস্তাবল। গাড়িতে জোড়ার জন্যে লাগাম পর্যন্ত বানিয়ে ফেলল পেনক্র্যাফট। আস্তাবল থেকে পোর্ট বেলুন পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হবার পর ওনাগা দুটোর পেছনে লাগল ওরা। কিন্তু লাগাম পরতে চাইল না ওনাগারা। বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত পরানো হলো লাগাম।

নতুন রাস্তায় এবার গাড়ি চালানোর পালা। গাড়োয়ান হলো নাবিক পেনক্র্যাফট। গাড়িতে উঠে বসে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল অভিযাত্রীরা। এ রহস্যময় নির্জন দ্বীপে গাড়ি হাঁকাবে এ কি ভাবতেও পেরেছিল ওরা? লাগাম ধরে ওনাগার পিঠে চাবুক মারল পেনক্র্যাফট। ছুটে চলল গাড়ি। ঝোপঝাড় কেটে কোনমতে তৈরি করা এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ। ঝাঁকুনির চোটে স্থির হয়ে বসতে পারছে না কেউ। শেষ পর্যন্ত বেলুন নিয়ে ওই গাড়িতে করেই নিরাপদে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এল সবাই।

দেখতে দেখতে কেটে গেল নতুন বছরের জানুয়ারি। ফেব্রুয়ারিও প্রায় শেষ। ইতিমধ্যে বেলুনের কাপড় কেটে প্রত্যেকের জামা-কাপড় তৈরি হয়ে গেল। পিপে বাঁধা সিন্দুকেই পাওয়া গিয়েছিল সুঁচ আর সুতা। কাজেই শার্ট প্যান্ট বানিয়ে নিতে কোন অসুবিধে হলো না। আগেই শুকিয়ে রাখা সীলের চামড়া দিয়ে তৈরি হলো জুতো।

বন জঙ্গল থেকে শাকসব্জি এনে খেতের উর্বর মাটিতে লাগানো হলো। খরগোশের মাংস তো আছেই, তাছাড়াও বড়শি দিয়ে নদী থেকে প্রচুর মাছ ধরছে পেনক্র্যাফট। ম্যাণ্ডিবল অন্তরীপ থেকে আসে কচ্ছপ, পেটে করে নিয়ে আসে ডিম। কাঠ আর কয়লার কোন অভাবই নেই। কাজেই শাকসব্জি-মাছ-মাংস-ডিম দিয়ে রান্না খাবার খেয়ে খেয়ে আর দ্বীপের খোলা হাওয়ায় চেহারা খুলে গেল সবার। কিন্তু এতসব খাওয়া থাকা সত্ত্বেও একটা জিনিসের অভাব কিছুতেই ভুলতে পারছিল না ওরা—রুটি।

এটা ওটা বিভিন্ন কাজ করার পর রান্নাঘরেই স্থায়ী চাকরি পেল মাস্টার জাপ। নেবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সে। রান্নাঘরে নেবকে সাহায্য করা থেকে শুরু করে খাবার টেবিলে খাবার পরিবেশন করা, হাতের কাছে পানির গেলাসটা, জগটা এগিয়ে দেয়া, সবই নিপুণ ভাবে করে সে। পথে বেরিয়েও সবাইকে সাহায্য করে। গাড়ির চাকা মাটিতে বসে গেলে কাঁধ দিয়ে ঠেলে তুলে দেয়, গাছে উঠে ফল পেড়ে আনে। আর অভিযানে বেরোলে হাতে একটা লাঠি নিয়ে দারোয়ানের মত সবার আগে আগে পথ চলে। মনে হচ্ছে এই জীবনটা তার পছন্দ হয়েছে বেশ। অন্য সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে খোঁয়াড়টাকে মজবুত করে ফেলল পেনক্র্যাফট। উঁচু কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি হলো খোঁয়াড়ের মজবুত বেড়া। খুঁটির আগাগুলো চেঁছে বর্শার মত চোখা করে ফেলল সে। মোটা মোটা ডাল কেটে এনে ঠেকা দিয়ে দিল বেড়ার

গায়ে। বড়সড় কোন জানোয়ারও এ বেড়া ভাঙতে পারবে না এখন।

ফেব্রুয়ারির শেষে শুরু হলো পশু ধরার কাজ। মুশমনের চারণ খেতে পৌঁছল ওরা এক সকালে। চারণ খেতের দু'দিকে পাহারায় রইল পেনক্র্যাফট, হার্ডিং, নেব আর জাপ। খোঁয়াড়ের দিকটা খোলা রেখে বাকি এক দিক থেকে তাড়া লাগাল হার্বার্ট আর স্পিলেট। তাড়া খেয়ে খোলা দিকে ছুট লাগাল মুশমনের দল খোঁয়াড়ের খোলা গেট দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ল বেশ কয়েকটা। বাকিগুলো পালিয়ে গেল এদিক ওদিক। খোঁয়াড়ের গেট বন্ধ করে দিয়ে প্রাণীগুলোকে গুণে ফেলল ওরা। মোট তিরিশটা মুশমন আটকা পড়েছে খোঁয়াড়ে। দশটা পাহাড়ী ছাগলও ঢুকে পড়েছে ওদের সাথে সাথে। মহাখুশি অভিযাত্রীরা পশম, চামড়া আর ভাল জাতের মাংসের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। চাই কি ছাগলগুলো বাচ্চা দিলে দুধও পাওয়া যাবে। খুশি মনে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে গেল ওরা।

এবার কৃষিকাজে মন দিল সবাই। খুঁজে পেতে বন থেকে এক ধরনের বীজ নিয়ে এল হার্বার্ট। চাপ দিলেই তেল বেরোয় ওগুলো থেকে। ওই বীজ জমিতে বুনে দেয়া হলো। তেলের চিন্তাও নেই আর। একরকম গাছের শিকড় থেকে তৈরি হলো বীয়ার জাতীয় মদ।

একদিন হাঁসজাতীয় দুটো বার্স্টার্ড পাখি এসে আস্তানা গাড়ল পোলট্রিতে। আর এল দুটো বনমোরগ।

গরমের দিনে বসে বিশ্রাম নেবার জন্যে লতাপাতা দিয়ে ঘিরে একটা বারান্দা মত তৈরি হলো প্রসপেক্ট হাইটের কিনারায়। দিনের শেষে এখানে বসে নিজেদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা আর গল্প করে অভিযাত্রীরা। চুপচাপ সবার কথা শুনে যান ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং। কাজের কথা ছাড়া একটা কথাও বলেন না। ভাবেন দ্বীপের রহস্য নিয়ে। ওরা এখানে আসার পর থেকে অনেকগুলো রহস্যময় ঘটনা ঘটে গেল পর পর। কিন্তু কোনটারই সমাধান পাওয়া গেল না আজও।

একুশ

মার্চের আরম্ভেই শুরু হলো ঝড় বৃষ্টি। বাইরে দুর্যোগ হলেও ঘরের ভেতর বসে নেই কেউ। এই সময়ই সবাই ধরে বসল ক্যাপ্টেনকে—একটা লিফটের বড় দরকার। সিঁড়ি বেয়ে ভারি জিনিস গ্র্যানাইট হাউসে তোলা বড় কষ্টকর।

'তা বানিয়ে নেয়া যাবে। কখন থেকে শুরু করতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'এখন থেকেই। কিন্তু লিফট চলবে কিসের শক্তিতে?' প্রশ্ন করল পেনক্র্যাফট।

'পানির শক্তিতে।'

একটা চোঙার একপ্রান্তে কয়েকটা প্রপেলার লাগালেন ক্যাপ্টেন, অন্যদিকে একটা চাকা। একটা লম্বা দড়ির একপ্রান্ত বেঁধে দেয়া হলো চাকায়। গ্র্যানাইট হাউসের ভেতরের ছোট্ট ঝর্নাটার ওপর বসানো হলো চোঙাটা, চোঙার প্রপেলার বসানো অংশটা রইল পানিতে। হ্রদ থেকে খাবার পানি ভেতরে আনার জন্যেই ঝর্নাটা কেটেছিলেন ক্যাপ্টেন। এখন সেটাকে আরও একটু বাড়িয়ে নিতেই চোঙার

প্রপেলারের ওপর জলপ্রপাতের মত প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানি। সুন্দর অথচ সহজ পদ্ধতি। হ্রদ থেকে ছুটে আসছে পানি, সাগরে বেরিয়ে যাচ্ছে কুয়োটা দিয়ে। আর ওই পানির ঝাপটায় বন বন করে ঘুরতে শুরু করেছে প্রপেলার লাগানো চোঙা—সেই সাথে চোঙার অন্য মাথার চাকা। ঘূর্ণায়মান চাকার গায়ে জড়াতে শুরু করল দড়ি। চোঙাটা উঠানো নামানোর ব্যবস্থাও করলেন ক্যাপ্টেন—ওপরের দিকে উঠালেই পানির স্রোত থেকে বেরিয়ে আসে প্রপেলার, কাজেই থেমে যায় ঘূর্ণন। তখন চাকায় আটকানো দড়ির অন্য মাথায় একটা কাঠের বাক্স লটকে দিতেই তৈরি হয়ে গেল লিফট। গ্র্যানাইট হাউসের দরজার পাশে কপিকল লাগিয়ে তাতে বসিয়ে দেয়া হলো লিফটের দড়ি।

সতেরোই মার্চ চালু হলো ওয়াটার লিফট। ভারি বোঝা তো ওপরে তুলছেই, নিজেরাও এর পর থেকে লিফটে করে ওঠানামা শুরু করে দিল ওরা। সবচে' মজা পেল টপ। দিনের মধ্যে অন্তত একশোবার ওঠে আর নামে।

এরপর কাঁচের জিনিস তৈরিতে হাত দেন ক্যাপ্টেন। কাঁচ তৈরির সমস্ত উপকরণই পাওয়া গেল দ্বীপে। বালি, খড়িমাটি, সোডা আর অন্যান্য মালমশলা একসাথে মিশিয়ে তন্দুরে জ্বাল দিয়ে তরল করা হলো। লোহার একটা নল বানিয়ে নিয়ে সেই নলের ভেতর ফুঁ দিয়ে তৈরি হয়ে গেল গেলাস, প্লেট, কাপ। আরও তৈরি হলো জানালার শার্সি। যদিও খুব মসৃণ হলো না জিনিসগুলো, কাজ চলে যাওয়ার মত হলো।

জঙ্গলের মধ্যে সাইকাস গাছ খুঁজে পেল হার্বার্ট। এর বোঁটায় ময়দার মত দেখতে একরকম গুঁড়ো পাওয়া যায়। ওগুলো দিয়ে চমৎকার কেক আর পুডিং তৈরি করে ফেলল নেব।

সেদিন পয়লা এপ্রিল। বারান্দায় বসে গল্প করছে সবাই। হঠাৎ ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলেন স্পিলেট, 'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন, আমাদের দ্বীপটা প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক কোন জায়গায় আছে, সেক্সট্যান্ট দিয়ে বের করা যায় না?'

'কি দরকার তা জেনে?' ক্যাপ্টেনের আগেই প্রশ্ন করে বসল পেনক্র্যাফট, 'বেশ আরামেই তো আছি আমরা এখানে।'

'তবুও, লিঙ্কন দ্বীপের কাছে পিঠে অন্য কোন দ্বীপ আছে কিনা জানা উচিত না?'

'ঠিকই বলেছেন। জেনে নিচ্ছি এখুনি,' বললেন ক্যাপ্টেন।

সিন্দুক থেকে ম্যাপ বের করে আনল হার্বার্ট। অন্যান্য জিনিসের সাথে ওটাও ছিল সিন্দুকের ভেতর। ম্যাপের প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর মন দিলেন ক্যাপ্টেন। সেক্সট্যান্টের সাহায্যে অংক করে বের করে ফেললেন মহাসাগরের ঠিক কোন বিন্দুতে আছে লিঙ্কন দ্বীপ। কিন্তু ঠিক ওই বিন্দুতে কোন দ্বীপের চিহ্ন নেই ম্যাপে। তবে লিঙ্কন দ্বীপ ম্যাপের যেখানে থাকার কথা তার থেকে দেড়শো মাইল উত্তর-পুবে ট্যাবর নামে একটা দ্বীপ আছে। কথাটা সবাইকে বললেন ক্যাপ্টেন।

'ওই ট্যাবর দ্বীপেই যাব। ডেকওয়ালা একটা বড় নৌকো বানিয়ে নেবখন। ঠিকমত হাওয়া পেলে দু'দিনেই পৌঁছে যাব ট্যাবর দ্বীপে,' বলল পেনক্র্যাফট।

রাজি হলো সবাই। আবহাওয়া ভাল থাকে অক্টোবরে। তার আগেই নৌকো তৈরির কাজ শেষ করতে হবে।

হাতে মাত্র দু'মাস আছে আর। এর মধ্যেই বানাতে হবে নৌকো। কাজে লেগে গেল পেনক্র্যাফট। উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম শুরু করল সে। সকালে কাজে বেরোবার সময়ই সারাদিনের খাওয়া সাথে নিয়ে যায় সে।

চিমনি আর প্রসপেক্ট হাইটের মাঝখানে তৈরি হলো ডকইয়ার্ড। ভাল গাছ কেটে তক্তা করে সারি দিয়ে রাখা হলো পাহাড়ের গায়ে। পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা করতে হবে নৌকোটা। পেনক্র্যাফটকে সাহায্য করতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। শিকার নিয়ে মত্ত রইল স্পিলেট-হার্বার্ট। আর ওই শিকারকে ভালমত রেঁধে পরিবেশন করা হলো নেবের কাজ।

শিকার করতে গিয়েই সেদিন মস্ত আবিষ্কারটা করে বসল হার্বার্ট আর স্পিলেট। গাছটার সোজা ডালে বড় বড় থ্যাবড়া পাতা। থোকায় থোকায় ঝুলছে আঙুরের মত ফল। সাথে সাথেই চেঁচিয়ে উঠল হার্বার্ট, 'কাজের কাজ হয়েছে একটা! পেনক্র্যাফট জানতে পারলে খুশিতে হার্টফেলই না করে বসে!'

'কি গাছ? তামাক নাকি?'

'ওই জাতীয়ই।'

'তাহলে কপাল খুলল পেনক্র্যাফটের!'

'পেনক্র্যাফটকে কথাটা এখন জানাব না আমরা, কি বলেন? একেবারে তামাক বানিয়ে পাইপে পুরে তুলে দেব ওর হাতে।'

'ঠিক। তাই করব আমরা।'

প্রচুর তামাক পাতা নিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরল দু'জনে। ক্যাপ্টেন আর নেবকে জানানো হলো খবরটা। পেনক্র্যাফটকে লুকিয়ে তামাক পাতা শুকিয়ে, কেটে তামাক বানাতে প্রায় দু'মাস লেগে গেল। এরই মাঝে একদিন লিঙ্কন দ্বীপের চারপাশের সাগরের পানিতে একটা তিমিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। তিমিটাকে দেখে হাত নিশপিশ করতে লাগল পেনক্র্যাফটের। পারলে হারপুন ছুঁড়ে তখনই মেরে ফেলে সে তিমিটাকে। কিন্তু তিমি শিকারের উপযুক্ত হারপুন আর নৌকো না থাকায় কাজটা করতে পারছে না সে। হঠাৎ একদিন ফ্লোটসাম পয়েন্টের কাছে কেন যেন আটকে গেল তিমিটা। ব্যাপারটা প্রথম দেখল নেব। আর সবাইকে খবরটা জানাতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ওরা সাগরতীরে।

হাজার হাজার মাংসাশী পাখি উড়ছে ফ্লোটসাম পয়েন্টের আকাশে। মড়ার গন্ধ পেয়েছে ওরা। মারা গেছে তিমিটা। বাঁ পাশের পাঁজরে গেঁথে আছে একটা হারপুন।

'দ্বীপের কাছে পিঠেই তাহলে তিমি শিকারী আছে!' বললেন স্পিলেট।

'তা নাও হতে পারে, মিস্টার স্পিলেট হারপুন নিয়েও অনেক সময় হাজার হাজার মাইল ছুটে চলে যায় তিমি। এটাও যে তা করেনি কি করে বুঝব!' তিমিটার দিকে তাকিয়ে বলল পেনক্র্যাফট।

একসময় তিমি শিকারী জাহাজে চাকরি করেছে পেনক্র্যাফট। এ ব্যাপারে তার জ্ঞান তাই আর সবার চাইতে বেশি। তিমিটার কাছে গিয়ে হারপুনটা পরীক্ষা করল সে। 'মেরিয়া স্টেলা, ভিনিয়ার্ড' কথাটা পরিষ্কার লেখা আছে হারপুনের হাতলে। সাথে সাথেই একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল পেনক্র্যাফট। ভিনিয়ার্ড তার জন্মস্থান। 'মেরিলা স্টেলা' জাহাজটাও চেনা।

পচন ধরার আগেই তিমির গায়ের সবচেয়ে দরকারী অংশ চর্বির স্তর কেটে আনল পেনক্র্যাফট। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে বলে রেখে দিল দরকারী কিছু হাড়। তিমির বিশাল দেহের বাকি অংশটা পড়ে রইল ওখানেই। অল্পক্ষণেই ওটা খেয়ে শেষ করবে শিকারী পাখির দল।

আড়াই ফুট পুরু চর্বির স্তর বড় বড় টুকরোয় কেটে জ্বাল দেয়া হলো মাটির পাত্রে। শুধু জিভ আর নিচের ঠোঁট থেকেই বেরোল হাজার পাউণ্ড তেল। স্টিয়ারিন আর গ্লিসারিন তৈরি করতে কাজে লাগবে এই তেল। আলোও জ্বালানো যাবে।

তিমির কিছু হাড় সমান মাপে ছোট ছোট করে কেটে একটা দিক চোখা করে নিলেন ক্যাপ্টেন। তিমির হাড় এভাবে কেটে নিয়ে বাঁকা করে বরফের তলায় চাপা দিয়ে রাখে রাশিয়া-আমেরিকার অ্যালুইসিয়ান শিকারীরা। কয়েকদিন পর ওগুলো তুলে নিয়ে চর্বি মাখিয়ে টোপ হিসেবে ফেলে রাখে জঙ্গলের ধারে। ওগুলো দেখলেই গিলে ফেলে ক্ষুধার্ত জানোয়ার। পাকস্থলীর তাপে ছিটকে সিধে হয়ে যায় বাঁকা হাড়। অল্পক্ষণের মধ্যেই নাড়ীভুঁড়ি ছেঁদা হয়ে মারা যায় হতভাগ্য জানোয়ার। ওই পদ্ধতিটাই ব্যবহার করতে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন।

দেখতে দেখতে এসে গেল একত্রিশে মে। সেদিন রাতের খাওয়ার পর উঠতে যাচ্ছিল পেনক্র্যাফট। কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিলেন ওকে স্পিলেট।

'আমার কাজ আছে, মিস্টার স্পিলেট, গল্প করার সময় নেই,' বলল পেনক্র্যাফট।

'আর এক কাফ কফি খাবে না?'

'না।'

'তামাক চলবে?'

'কি বললেন?' বিমূঢ়ের মত সবার মুখের দিকে চাইতে লাগল পেনক্র্যাফট। মিটিমিটি হাসছে নেব। একটা তামাক ঠাসা পাইপ ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন স্পিলেট।

ছোঁ মেরে পাইপটা নিয়ে নিল পেনক্র্যাফট। পরক্ষণেই মুখে পুরে টানতে শুরু করল। কিন্তু ধোঁয়া বেরোল না। তামাকে আগুন না দিয়েই টানতে শুরু করেছে সে। হেসে উঠে ওর দিকে আগুন এগিয়ে দিল হার্বার্ট।

তামাকে আগুন দিয়ে মিনিট খানেক চুপচাপ পাইপ টানল নাবিক। আশ্চর্য এক তৃপ্তি ফুটে উঠল ওর চেহারায়। তারপর মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বলল, 'চমৎকার তামাক! তুলনা হয় না। এতবড় আবিষ্কার কে করল শুনি?'

'মিস্টার স্পিলেট,' উত্তর দিল হার্বার্ট।

তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পেনক্রাফট, একটানে চেয়ার থেকে তুলেই জড়িয়ে ধরল স্পিলেটকে।

'আরে ছাড়ো, ছাড়ো, করছ কি?' জোর করে পেনক্র্যাফটের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হলেন স্পিলেট, 'আমি শুধু গাছটাই দেখেছিলাম হার্বার্ট না চিনলে আর ক্যাপ্টেন তামাকটা তৈরি না করে দিলে তো কোন কাজেই আসত না ওই গাছের পাতা। ওদিকে কথাটা অ্যাদ্দিন তোমাকে জানাতে না পারায় পেট ফুলে তো প্রায় মারাই যাচ্ছিল নেব। কাজেই ধন্যবাদটা সবাইকে দাও।'

বাইশ

আবার এল শীত। কিন্তু এবার আর শীতকে মোটেই তোয়াক্কা করল না অভিযাত্রীরা। মুশমনের লোম কেটে উল তৈরি হয়ে গেছে। প্রথমে কাঠের গামলায় অল্প গরম পানিতে ভাল করে ধোয়া হয়েছে লোমগুলো। তারপর ওই পানিতেই লোমগুলো চব্বিশ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে দূর করা হয়েছে তৈলাক্ত ভাবটা। সোডার পানিতে ধুয়ে নেবার পর একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে উল। কাঠের বড় বড় গামলায় ছড়িয়ে রাখা হয়েছে সাবান মাখা লোম। গ্র্যানাইট হাউসের কৃত্রিম জলপ্রপাতের শক্তি দিয়ে চালানো হয়েছে ক্যাপ্টেনের

তৈরি চরকা আর প্রেশার মেশিন। চরকায় লোমের সুতো কেটে প্রেশার মেশিনে চাপ দিয়ে তৈরি হয়েছে ফেল্টের মত গরম কাপড়। একবারে বাজে হয়নি ওই কাপড় থেকে আনাড়ি হাতে তৈরি করা কোট, প্যান্ট, হ্যাট, কম্বল। এতসব গরম কাপড়চোপড় থাকলে আর শীতকে ভয় পাবার কি আছে?

বিশে জুন থেকেই পড়ল কনকনে শীত। তার ওপর মাঝে মাঝেই ঝাপটা মারছে হিমেল হাওয়া। এত ঠাণ্ডায় নৌকোর কাজ চালিয়ে যেতে না পেরে গ্র্যানাইট হাউসে বসে প্যান প্যান করতে থাকল পেনক্র্যাফট।

জুনের শেষে বরফ পড়া শুরু হলো। তাই সপ্তাহে একবার খোঁয়াড়ে গিয়ে জন্তু-জানোয়ারের তদারক করে আসে অভিযাত্রীরা। এই সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। একটা অ্যালবেট্রসকে গুলি করেছিল হার্বার্ট। পাখিটা পড়ে যাবার পর পরীক্ষা করে দেখা গেল আঘাত গুরুতর নয়। কয়েকদিন চিকিৎসা করতেই সেরে উঠল পাখিটা। একটা মতলব এল স্পিলেটের মাথায়। লিঙ্কন দ্বীপে ওদের নির্বাসনের কথাটা কাগজে লিখে একটা থলিতে ভরলেন তিনি। সেই সাথে একটা ছোট্ট কাগজে 'থলিটা পেলে দয়া করে নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডের অফিসে পৌঁছে দেবেন' এই কথাটা লিখে থলিতে ভরলেন। থলিটা অ্যালবেট্রসের গলায় বেঁধে উড়িয়ে দিলেন পাখিটাকে। ভাগ্যক্রমে পাখিটা কারও হাতে ধরা পড়লে অভিযাত্রীদের উদ্ধার পাবার একটা ব্যবস্থা হয়েও যেতে পারে।

জুলাইয়ে এত শীত পড়ল যে আর একটা ফায়ার প্লেসের ব্যবস্থা করতে হলো। প্রায়ই আগুনের পাশে বসে গল্প করে ওরা, সেদিনও করছে। একটু পর পরই চা আসছে। তামাকও আছে প্রচুর।

হঠাৎ কান খাড়া করে কি যেন শুনল টপ, পরক্ষণেই ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গেল কুয়োর পাড়ে। জাপও অনুসরণ করল ওকে।

'কুয়োর তলায় আবার এল নাকি জানোয়ারটা!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন স্পিলেট।

সবাই উঠে গিয়ে মশালের আলোয় দেখার চেষ্টা করল কুয়োর তলাটা। কিন্তু দেখা গেল না। জোর করে টপ আর জাপকে কুয়োর ধার থেকে ফিরিয়ে আনল পেনক্র্যাফট। কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

পর পর কয়েকদিন তুষারপাত আর ঝড়ে প্রসপেক্ট হাইটের ওপরকার পাখির বাসার বেশ ক্ষতি হলো। কিন্তু পাহাড়ের আড়ালে থাকায় বেঁচে গেল খোঁয়াড়টা।

আগস্টের দিকে শান্ত হয়ে এল আবহাওয়া। তেসরা আগস্ট শিকারে বেরোল অভিযাত্রীরা। কিন্তু কাজের ছুতোয় গ্র্যানাইট হাউসেই থেকে গেলেন ক্যাপ্টেন। সবার অজান্তে কুয়োর ভেতরটা দেখার ইচ্ছা তাঁর। কুয়োর ভেতর কোন্ জানোয়ার এসে বসে থাকে দেখতে হবে তাঁকে। হয়তো পর পর ঘটে যাওয়া রহস্যগুলোর সমাধানও পাওয়া যাবে ওই কুয়োয়।

লিফট চালু হওয়ার পর থেকেই তুলে রাখা হয়েছিল সিঁড়িটা। কুয়োর পাড়ে শক্ত করে দুটো খুঁটি গাড়লেন ক্যাপ্টেন। সিঁড়ির ওপরের একটা খাঁজে দড়ি বাঁধলেন। তারপর সিঁড়িটা কুয়োর ভেতর নামিয়ে দিয়ে খাঁজে বাঁধা দড়িটা শক্ত করে বাঁধলেন খুঁটির গায়ে। কোমরের বেল্টে গুঁজে নিলেন পিস্তল আর ছুরি। হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন নিচে। ওই অন্ধকার রহস্যময় কুয়োয় নামতে বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না তিনি।

খোঁচা খোঁচা পাথর বেরিয়ে আছে কুয়োর দেয়ালে। ইচ্ছে করলেই মানুষ বা বানর ওই বেরিয়ে থাকা পাথরের খাঁজ বেয়ে ওঠা-নামা করতে পারে। কুয়োর একেবারে নিচে নেমেও কিছু দেখতে পেলেন না তিনি। নিরেট দেয়ালের সবদিকেই

ঠুকে ঠুকে দেখলেন, কিন্তু ফাঁপা বলে মনে হলো না। শান্ত টলটলে পানির নিচে কোন সুড়ঙ্গ আছে কিনা বোঝা গেল না।

অনেকক্ষণ দেখে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তিনি। কোন না কোন রহস্য নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে—কথাটা জোর করেও মন থেকে তাড়াতে পারলেন না ক্যাপ্টেন।

সন্ধ্যায় পাখির বোঝা নিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এল অভিযাত্রীরা। জাপের সারা গায়ে স্নাইপের বাণ্ডিল, টপের গলায় টিলের মালা। বেশ কিছু টাটকা খাওয়ার পরও প্রচুর পাখি নুন দিয়ে শুকিয়ে রাখা হলো ভবিষ্যতের জন্যে।

কুয়োতে নামার কথা সবার আড়ালে স্পিলেটকে জানালেন ক্যাপ্টেন। স্পিলেটও সায় দিলেন—কিছু একটা রহস্য আছেই ওই কুয়োয়।

আবার নৌকোর কাজে মন দিল পেনক্র্যাফট। সারাদিন ওকে সাহায্য করে হার্বার্ট। আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল কাজ।

স্পিলেটের সামান্য একটা ভুলের জন্যে সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনাটা ঘটল এগারোই আগস্ট। সেদিন রাতে গভীর ঘুমে অচেতন সবাই। ভোর চারটের দিকে টপের বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল ওরা।

না, কুয়োর কাছে চেঁচাচ্ছে না টপ, বাইরে থেকে আসছে আওয়াজটা। জানালার কাছে ছুটে গেল সবাই। গভীর অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না, কিন্তু পোলট্রির দিক থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ বুনো জানোয়ারের চিৎকার। নেকড়ে ঢুকল নাকি!

'সেরেছে,' উত্তেজিত ভাবে বলল পেনক্র্যাফট, 'পাখিগুলোর বারোটা বাজাবে শয়তানের দল। কিন্তু নদী পেরোল কি করে ওগুলো?'

'আমার ভুল,' লজ্জিত ভাবে বললেন স্পিলেট, 'ব্রিজের মাঝের অংশটা খুলে রাখিনি কাল।'

কিন্তু ও নিয়ে ভেবে আর সময় নষ্ট করল না কেউ। তাড়াতাড়ি বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়ল সবাই। পোলট্রি হাউসটাকে আগে বাঁচানো দরকার। মোটা একটা মুগুর হাতে আগে আগে ছুটল জাপ। অভিযাত্রীদের দেখেও পালিয়ে গেল না জানোয়ারের দল। অন্ধকারে ঝক ঝক করছে অসংখ্য সবুজাভ চোখ—মেরু শেয়াল। একশোর কম হবে না।

একমুহূর্ত দ্বিধা করে শেয়ালগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জাপ। বিশাল মুগুর দিয়ে ওগুলোকে দমাদম পিটিয়ে চলল সে। লাফ মেরে গিয়ে একটা শেয়ালের টুঁটি কামড়ে ধরল টপ—এপাশ ওপাশ মাথা ঝাঁকাতেই কাঠি ভাঙার মত মট করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। ভারটেব্রা ভেঙে গেছে শেয়ালটার। ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটা শেয়ালের দিকে ছুটে গেল টপ। ওদিকে অভিযাত্রীদের বন্দুকের গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠল লিঙ্কন দ্বীপ। ভোরের আলো দেখা দিতেই শেষ হলো প্রচণ্ড লড়াই। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল শেয়ালের দল, এদিক ওদিক মরে পড়ে আছে শেয়ালের লাশ।

নিজেদের দিকে নজর দেবার সুযোগ পেল এবার সবাই। কিন্তু আশপাশে কোথাও জাপকে দেখা গেল না। কোথায় গেল জাপ? বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ফিরল না জাপ। বাধ্য হয়ে ওকে খুঁজতে শুরু করল অভিযাত্রীরা।

এক জায়গায় কতগুলো শেয়াল মরে স্তূপ হয়ে আছে। স্তূপগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে একটা লোমশ কালো হাত। সাথে সাথে ওদিকে ছুটল সবাই। দ্রুত মরা শেয়ালের স্তূপ সরাতেই পাওয়া গেল জাপকে। মড়ার মত পড়ে আছে

জাপ। বুকে মুখে অসংখ্য কামড়ের দাগ। মুগুরের গোড়াটা ধরে রেখেছে হাতের মুঠোয়।

বেপরোয়া হয়ে শেয়ালগুলোর সাথে লড়েছে সে। মুগুরটা ভেঙে যেতেই শেয়ালরা কাবু করে ফেলে ওকে। কিন্তু বেঁচে আছে তো জাপ? ওর বুকে কান পেতে শুনল নেব। মৃদু ধুকপুক করছে হৃৎপিণ্ডটা। এখনও বেঁচেই আছে জাপ।

ধরাধরি করে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে আসা হলো জাপকে। প্রাণপণে ওর সেবায় মগ্ন হলো সবাই। পরীক্ষা করে দেখা গেল আঘাতগুলো তেমন গুরুতর নয়। আসলে রক্তক্ষরণেই কাহিল হয়ে পড়েছে জাপ।

প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনযুক্ত খাবার খেয়ে আর অভিযাত্রীদের আন্তরিক সেবা যত্নে দিন দশেকের মধ্যেই খাড়া হয়ে উঠল জাপ। এ সময় রোজ রাতে জাপের বিছানার কাছে শুয়ে থাকত ওর বন্ধু টপ। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে ঘুমন্ত জাপের হাত চেটে আদর করত কুকুরটা।

পঁচিশে আগস্ট। রাতের খাবার পর রান্নাঘরে থালাবাসন গোছাচ্ছে নেব। আগুনের পাশে বসে গল্প করছে আর সবাই। হঠাৎ নেবের চিৎকারে ছুটে এল সবাই।

'কি হলো, নেব?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

উত্তরে আঙুল দিয়ে ঘরের কোণে দেখিয়ে দিল নেব। সেদিকে তাকিয়েই সবার চক্ষু চড়কগাছ। একটা চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে গভীর মনোযোগের সাথে পাইপ টানছে জাপ। হো হো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকাল জাপ। অত হাসির কি হলো বুঝতে পারল না সে। তারপর আবার পাইপটা মুখে লাগাতেই হাসতে হাসতে বলল পেনক্র্যাফট, 'দারুণ দেখালে, জাপ! ওই পাইপটা আজ থেকে তোমাকেই দান করে দিলাম।'

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই নৌকোর কাজ শেষ হয়ে গেল। নৌকোটার নাম রাখা হলো বন-অ্যাডভেঞ্চার। বেলুনের অবশিষ্ট কাপড় দিয়ে তৈরি হলো পাল। লিঙ্কন দ্বীপের একটা পতাকাও তৈরি করে ফেলল হার্বার্ট। অবিকল আমেরিকার জাতীয় পতাকার মত করা হলো পতাকাটা, শুধু একটা নক্ষত্র বাড়িয়ে দেয়া হলো ওতে। পতাকাটা নৌকোর মাস্তুলে উড়িয়ে দিতেই পতাকার সম্মানে তিনবার বন্দুকের আওয়াজ করে স্যালুট করল অভিযাত্রীরা।

দশই অক্টোবর বন-অ্যাডভেঞ্চারকে পানিতে ভাসানো হলো। সকাল সাড়ে দশটায় সাথে খাবার আর পানি নিয়ে সাগর অভিযানে বেরোল অভিযাত্রীরা। মাইল চারেক এগিয়ে যাবার পর লিঙ্কন দ্বীপের দিকে ফিরে চাইল সবাই। দূর থেকে অপূর্ব সুন্দর লাগছে দ্বীপটাকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে সেদিকে চেয়ে আছে সবাই, নীরবতা ভাঙল পেনক্র্যাফট, 'কেমন হয়েছে নৌকোটা, ক্যাপ্টেন?'

'খুব ভাল,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন।

'দূর সাগরে যাবার মত হয়েছে?'

'দূর বলতে কতদূর বোঝাচ্ছ তুমি?'

'ট্যাবর দ্বীপ?'

'খামোকা ওখানে গিয়ে লাভ কি, পেনক্র্যাফট? তাছাড়া একা তো তুমি যেতে পারছ না, সঙ্গী একজন লাগবেই'

'তা লাগবে।'

'শুধু শুধু কেন দু'জনের জীবন বিপন্ন করবে? দরকার থাকলে তোমার সাথে আরও দূরে যেতে রাজি আমি। কিন্তু অযথা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাভ কি!'

একটু পরই তীরের দিকে ফিরে চলল বন-অ্যাডভেঞ্চার, লক্ষ্য পোর্ট বেলুন। পোর্ট বেলুনের কাছের চ্যানেলেই নৌকোটা রাখতে হবে। কাজেই চ্যানেলটা একটু ভাল করে দেখা দরকার। তীর থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে নৌকো, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হার্বার্ট, 'পেনক্র্যাফট, পানিতে একটা বোতল ভাসছে।' বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে পানি থেকে বোতলটা তুলে আনল সে। শক্ত ভাবে ছিপি আঁটা বোতলটা। হার্বার্টের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে ছিপিটা খুলে ফেললেন ক্যাপ্টেন। উপুড় করে নাড়তেই এক টুকরো কাগজ বেরোল বোতলের ভেতর থেকে। কাগজটায় লেখা, 'ট্যাবর আইল্যাণ্ডে নির্বাসিত রয়েছে দুর্ভাগা লোকটা, ১৫৩° পশ্চিম দ্রাঘিমা, ৩৭° ১১´ দক্ষিণ অক্ষাংশ'।'

তেইশ

'এখনও কি বাধা দেবেন, ক্যাপ্টেন? মাত্র দেড়শো মাইল দূরে আটকে আছে একজন হতভাগ্য লোক।' সুযোগ পেয়ে বলল পেনক্র্যাফট।

'কালকেই যাচ্ছ তুমি, পেনক্র্যাফট।' কাগজের টুকরোটা উল্টে-পাল্টে দেখলেন ক্যাপ্টেন, 'মনে হচ্ছে নির্বাসিত লোকটা নৌবিদ্যায় পারদর্শী। ট্যাবর দ্বীপের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের সাথে ওর হিসেব মিলে যাচ্ছে। যদ্দূর মনে হয় ইংরেজ বা আমেরিকান লোকটা, নইলে ইংরেজিতে চিঠি লিখত না।'

'সিন্দুকের ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হলো। ট্যাবর দ্বীপের ধারে কাছেই ডুবেছিল তাহলে সিন্দুকবাহী জাহাজটা!' বললেন স্পিলেট।

'লোকটার কপাল ভাল বলতে হবে, নাহলে একেবারে বন অ্যাডভেঞ্চারের যাত্রাপথেই বোতলটা পৌঁছল কেন?' বলল হার্বার্ট।

তাই তো, ঠিক এখানেই এল কেন বোতলটা? প্রশ্নটা খপ করে বিঁধল ক্যাপ্টেনের মনে। এও এ দ্বীপের আরেক রহস্য নয়তো?

যাবার কথা ছিল দু'জনের—পেনক্র্যাফট আর হার্বার্ট। কিন্তু প্রতিবাদ করে বসলেন স্পিলেট। তাঁর কথা হলো, সাংবাদিক হয়ে জাহাজডুবির ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখবেন না, তা কি হতে পারে? কাজেই রাজি হতে হলো ক্যাপ্টেনকে।

এগারোই অক্টোবর সকালে লিঙ্কন দ্বীপের পতাকা উড়িয়ে রওনা দিল বন অ্যাডভেঞ্চার। প্রচুর পরিমাণে খাবার আর পানীয় সাথে নেয়া হয়েছে। চিন্তার কিছু নেই। গ্র্যানাইট হাউসের চুড়োয় দাঁড়িয়ে ওদেরকে বিদায় জানালেন ক্যাপ্টেন আর নেব।

দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল গ্র্যানাইট হাউস। দূর থেকে লিঙ্কন দ্বীপকে একটা সবুজে ছাওয়া ঝুড়ির মত লাগল। ঝুড়িটার ওপর থেকে বেরিয়ে আছে ফ্র্যাঙ্কলিন হিল। বিকেল নাগাদ দিগন্তের ওপারে হারিয়ে গেল দ্বীপটা।

সবচেয়ে খুশি পেনক্র্যাফট। বহুদিন পর সে আবার নৌকো ভাসিয়ে দূর সাগরে এসেছে। ঝিরঝিরে বাতাসে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে বন অ্যাডভেঞ্চার। মাঝে মাঝে পেনক্র্যাফটকে সরিয়ে হাল ধরছে হার্বার্ট। ক্রমে রাতের আঁধার ঘনিয়ে এল সাগরের বুকে। নক্ষত্র আর কম্পাস দেখে দিক নির্ণয় করে নৌকা চালাচ্ছে পেনক্র্যাফট। খুবই আনন্দে কাটল ওদের সারাটা রাত। ভোর হলো এক সময়। দিনটাও ভালভাবেই কাটল। বিকেলে হিসেব করে দেখা গেল লিঙ্কন দ্বীপ থেকে একশো বিশ মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা। এভাবে চললে আগামী কাল

ভোরেই পৌঁছে যাবে ট্যাবর আইল্যাণ্ডে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কারও চোখেই ঘুম এল না সে রাতে। ভোর ছ'টায় দিগন্তে ভেসে উঠল একটা দ্বীপ।

'ওটাই ট্যাবর আইল্যাণ্ড!' বলল পেনক্র্যাফট।

বেলা এগারোটায় ট্যাবর আইল্যাণ্ড থেকে মাইল ছয়েক দূরে এসে পৌঁছল বন অ্যাডভেঞ্চার। এবার খুব সাবধানে নৌকো চালাতে লাগল পেনক্র্যাফট। সাগর এখানে অজানা, পানির নিচে ডুবো পাহাড় থাকলে আর তাতে ধাক্কা লাগলেই হয়েছে! ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে নৌকোর তলা

দুপুর বারোটায় ট্যাবর আইল্যাণ্ডের তীরে নোঙর ফেলল বন-অ্যাডভেঞ্চার। ডাঙায় লাফিয়ে নামল তিন অভিযাত্রী। প্রথমেই দ্বীপের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দরকার। প্রায় আধ মাইল দূরে একটা শ'তিনেক ফুট উঁচু ছোট্ট পাহাড় + সেদিকেই রওনা হলো তিনজনে। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল পাহাড়টার কাছে। এদিক ওদিক একনজর দেখে নিয়ে উঠে পড়ল চূড়ায়। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা গেল দ্বীপটা। বড় জোর মাইল ছয়েক হবে দ্বীপটার পরিধি। আকারটা ডিমের মত। মাঝে মাঝে ঘন জঙ্গলে ছাওয়া দ্বীপটায় লিঙ্কন দ্বীপের মত চড়াই-উৎরাই নেই।

পাহাড় থেকে নেমে দ্বীপটা ঘুরে দেখতে লাগল অভিযাত্রীরা। সমুদ্রের ধার ধরে পুরো দ্বীপটা একপাক ঘুরে আসতে চার ঘণ্টা লেগে গেল। ওদের দেখে ডানা ঝাপটে উড়ে পালাল পাখির দল, সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে ডুব দিল সীলেরা। পরিষ্কার বোঝা গেল, আগেই মানুষের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে ওদের। কিন্তু মানুষ কই? তবে কি অন্য কোথাও চলে গেছে আটকা পড়া লোকটা? নাকি মরে গেছে? বোতলের কাগজে কোন তারিখ লেখা ছিল না। কতদিন বোতলটা পানিতে ভেসেছে কে জানে।

বন-অ্যাডভেঞ্চারে ফিরে দুপুরের খাওয়া সারল অভিযাত্রীরা। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আবার বেরিয়ে পড়ল। এক জায়গায় চরে বেড়াচ্ছিল কতগুলো ছাগল আর শুয়োর, অভিযাত্রীদের দেখেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। জঙ্গলের ভেতর পায়ে-চলা পথের সন্ধানও পাওয়া গেল। রাস্তার পাশেই এক জায়গায় একটা কাটা গাছ পড়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় কুড়ালে কাটা। জঙ্গলের বুক চিরে কোণাকোণি ভাবে দ্বীপের ভেতর ঢুকে গেছে রাস্তাটা। এ রাস্তা ধরেই হাঁটতে লাগল অভিযাত্রীরা। মাঝে মাঝে দু'এক জায়গায় বাঁধা কপি আর টার্নিপের চাষ করেছিল কেউ, কিন্তু এখন তা অযত্নে পড়ে আছে।

'খেতের যা অবস্থা, দেখে মনে হচ্ছে এখন আর দ্বীপে কেউ থাকে না,' চলতে চলতে বললেন স্পিলেট।

'ঠিক,' বলল পেনক্র্যাফট, 'বহু আগেই দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে লোকটা। বোতলটা সাগরের পানিতে ভাসতে ভাসতে আমাদের হাতে পৌঁছেচে অনেক পরে।'

সাঁঝ ঘনিয়ে এসেছে। আর জঙ্গলে থাকা উচিত নয় ভেবে ফেরার কথা ভাবছে সবাই, হঠাৎ হার্বার্ট বলল, 'আরে! দেখুন, দেখুন, একটা কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে না?'

'তাই তো!' বলল পেনক্র্যাফট। সাথে সাথেই সেদিকে ছুটল সবাই। কাঠের তক্তা দিয়ে ঘেরা কুঁড়েটা, তেরপলের ছাউনি দিয়ে চাল বানানো হয়েছে। আধ ভেজানো দরজায় ঠেলা মেরে ভেতরে ঢুকল পেনক্র্যাফট। খাঁ খাঁ করছে কুঁড়ের ভেতর। শূন্য কুটির।

অন্ধকারে ভূতের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পেনক্র্যাফট, হার্বার্ট আর স্পিলেট। চেঁচিয়ে ডেকেও কারও সাড়া না পেয়ে আগুন জ্বালল পেনক্র্যাফট। ঘরে মানুষ

থাকার সমস্ত চিহ্ন বর্তমান। এক পাশে আগুন পোহানোর চুল্লী। হলদেটে চাদর পাতা স্যাঁতসেঁতে বিছানা, দেখেই বোঝা যায় বহুদিন কেউ শোয়নি ওখানে। দুটো মরচে ধরা কেটলি পড়ে আছে চুল্লীর একপাশে, অন্য পাশে কিছু কয়লা আর কাঠ। ময়লা, ছেঁড়া একটা নাবিকের পোশাক পড়ে আছে তাকের ওপর। টেবিলের ওপর টিনের প্লেট আর বাইবেল। এক কোণে কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, দুটো বন্দুক—একটা ভাঙা, এক পিপা বারুদ, কার্তুজ আর ছররাও পড়ে আছে। সবই পুরু ধুলোর স্তরে ঢাকা।

'বহুদিন ধরেই ঘরটা খালি,' পেনক্র্যাফট বলল, 'রাতটা এ ঘরেই কাটিয়ে দেয়া যাক, কি বলেন, মিস্টার স্পিলেট?'

'সেই ভাল। ফিরে এলে আমাদের দেখা পেয়ে যাবে লোকটা।'

'থাকলে তো ফিরবে।'

'লোকটা দ্বীপে নেই বলতে চাও? জাহাজডুবি হওয়া অসহায় নাবিকের কাছে ওই সব যন্ত্রপাতি, বন্দুক আর কার্তুজের দাম অনেক, ফেলে যেত না সে ওগুলো। জীবিত হোক, মৃত হোক এখনও এ-দ্বীপেই আছে সে।'

কিন্তু সে রাতে ফিরল না লোকটা। ভোর হতেই ওর মৃতদেহ খুঁজতে বেরোল অভিযাত্রীরা, কঙ্কালটা পেলেও কবর দিয়ে যাবে। সুন্দর জায়গায় তৈরি করা হয়েছে কুঁড়েঘরটা। সামনে মাঠ, দূরে সাগর, বাঁ দিকে নদীর মুখ, ডানপাশে জঙ্গল আর পেছনে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট পাহাড়। বাড়ির সামনের খানিকটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল এককালে, এখন তা জীর্ণ। রাতের বেলা অত খেয়াল করেনি ওরা, কিন্তু এখন দেখল কোন জাহাজের তক্তা দিয়ে তৈরি হয়েছে কুঁড়েটা। হঠাৎ কাঠের একজায়গায় একটা অস্পষ্ট ইংরেজি শব্দ দেখলেন স্পিলেট। শব্দটার মাঝখানে কয়েকটা অক্ষর মুছে গেছে। যেটুকু পড়া যায় তা হলো **Br-tan-a**. কি হতে পারে শব্দটার মানে? নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগলেন স্পিলেট। আচ্ছা Br এর পরে যদি i আর tan এর পরে in হয় তাহলে দাঁড়ায়? Britannia! হ্যাঁ, তাই হবে শব্দটা। জাহাজটার নাম।

দুপুর নাগাদ দ্বীপের অর্ধেকটা খোঁজা হয়ে গেল। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন মরা মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেল না। ক্লান্ত হয়ে একটা গাছ তলায় বিশ্রাম করতে বসল অভিযাত্রীরা।

'চলো, কালই ফিরে যাই আমরা,' বললেন স্পিলেট। 'খেত থেকে কিছু বাঁধা কপি আর মুলার বিচি তুলে নাও, লিঙ্কন দ্বীপে জন্মানো যাবে।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ঝোপের ভেতর তাড়া করে দুটো শুয়োরকে প্রায় কায়দা করে এনেছেন স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট, এমন সময় উত্তর দিক থেকে ভেসে এল হার্বার্টের চিৎকার, সেই সাথে কলজে কাঁপানো অমানুষিক হুঙ্কার। ঝোপঝাড় টপকে ঝড়ের বেগে সেদিকে ছুটলেন স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট। খোলা মাঠে পৌঁছে দেখা গেল মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে হার্বার্ট। বুকের ওপর চেপে বসেছে একটা ভয়ঙ্কর দর্শন জংলী। সর্বনাশ! জংলী আছে নাকি দ্বীপে?

লাফ দিয়ে গিয়ে জংলীটার দু'হাত চেপে ধরল পেনক্র্যাফট আর স্পিলেট। বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর কাবু হলো জংলীটা। শক্ত করে ওর হাত-পা পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল হার্বার্ট।

'এ লোকটাকেই খুঁজছি বোধহয় আমরা!' পেনক্র্যাফট বলল।

'হ্যাঁ, কিন্তু ও আর এখন লোক নেই। চেহারা আর স্বভাবে একেবারে পশু হয়ে গেছে,' বললেন স্পিলেট।

লম্বা লম্বা চুল-দাড়িতে ঢেকে গেছে লোকটার চেহারা। হাত-পায়ে বহুদিনের

না কাটা নখ। ময়লা দাঁত বের করে মাঝে মাঝেই রুদ্ধ আক্রোশে গজরাচ্ছে লোকটা। এককালে যে ও মানুষ ছিল তাও বোধ হয় ভুলে গেছে। কিছু কথা জিজ্ঞেস করলেন ওকে স্পিলেট। কিন্তু শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল লোকটা, কথা বলল না স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে কিনা কে জানে!

'লিঙ্কন দ্বীপে নিয়ে যেতে হবে ওকে,' বললেন স্পিলেট।

'সেবাযত্ন করলে ভাল হয়েও উঠতে পারে,' সায় দিল হার্বার্ট।

পায়ের বাঁধন খুলে দিতেই উঠে দাঁড়াল লোকটা পালাবার চেষ্টা করল না। হাঁটতে বলতেই অভিযাত্রীদের সাথে চলতে শুরু করল সে। মাঝে মাঝে চকিত দৃষ্টিতে চাইছে ওদের দিকে প্রথমেই কুঁড়েয় নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। কুঁড়েটা আর ভেতরের জিনিসপত্র দেখেও ভাবান্তর হলো না ওর। এর পর বন অ্যাডভেঞ্চারে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে লোকটাকে পেনক্র্যাফটের পাহারায় রেখে নৌকো থেকে নেমে এল হার্বার্ট আর স্পিলেট। কপি আর মুলোর বীজ সংগ্রহ করতে হবে

শেষ পর্যন্ত ফাঁদে ফেলে দুটো শুয়োরকে ধরতে পারল হার্বার্ট আর স্পিলেট। বীজ জোগাড় করে শুয়োর দুটোকে নিয়ে নৌকোয় ফিরে এল ওরা। কুঁড়ে থেকে বন্দুক আর গোলাবারুদগুলো নিতেও ভুলল না।

চুপচাপ আগের জায়গাতেই বসে আছে নির্বাসিত লোকটা। ওদেরকে দেখেও দেখল না। রান্না করা খাবার সাধা হলো, হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল বাসন। কি মনে হতে একটা হাঁস জবাই করে কাঁচাই ওর সামনে বাড়িয়ে ধরলেন স্পিলেট। থাবা মেরে হাঁসটা ছিনিয়ে নিল লোকটা। পালকগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে কামড় বসাল কাঁচা মাংসে।

'ব্যাটা গেছে! ওটাকে আর মানুষ করা যাবে না।' আফসোস করল পেনক্র্যাফট।

রাতটা নিরাপদেই কাটল। ভোরবেলাও একই জায়গায় বসে চুপচাপ সাগরের দিকে চেয়ে আছে লোকটা। রাতে ঘুমিয়েছে কিনা কে জানে।

সেদিন পনেরোই অক্টোবর। সকাল হতেই লিঙ্কন দ্বীপের উদ্দেশে রওনা দিল বন-অ্যাডভেঞ্চার। একটু যেন ঘাবড়ে গেল লোকটা। উঠে দাঁড়িয়ে একটু হাঁটতে গিয়েও আবার বসে পড়ল আগের জায়গায়।

ষোলোই অক্টোবর বাতাসের বেগ বেড়ে গেল। চিন্তিত হলো পেনক্র্যাফট।

সতেরোই অক্টোবর। ওরা রওনা দেবার পর আটচল্লিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু লিঙ্কন দ্বীপের দেখা মিলল না।

আঠারোই অক্টোবরেও দ্বীপের দেখা নেই। আরও বেড়েছে হাওয়ার জোর। ফুঁসে উঠছে সাগর। মাঝে মাঝেই নৌকোর ওপর আছড়ে পড়ছে বিশাল ঢেউ। সতর্ক হলো অভিযাত্রীরা। কোমরে দড়ি বেঁধে দড়ির আরেক মাথা ডেকের সাথে বেঁধে রাখল। নাহলে যে কোন সময় ঢেউয়ের ঝাপটায় ছিটকে সাগরে পড়ার আশঙ্কা আছে। ক্রমেই ভেঙে পড়া ঢেউয়ের পানি জমা হচ্ছে কার্নিস ঘেরা ডেকে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল লোকটা। উঠে গিয়ে কুড়াল দিয়ে কার্নিসের একজায়গায় ভেঙে দিল। সাথেসাথে বেরিয়ে গেল পানি। এবার আর পানি জমা হতে পারছে না ডেকে। ওর কাণ্ড দেখে অভিযাত্রীরা অবাক।

তার পরদিনও লিঙ্কন দ্বীপের দেখা মিলল না। পরিষ্কার বুঝল ওরা—পথ হারিয়েছে। রাত নামতেই ভাবনা বেড়ে গেল। এগারোটা নাগাদ আস্তে আস্তে কমে এল হাওয়ার গতি, শান্ত হলো সাগর। কিন্তু ঘুম এল না কারও চোখে। লিঙ্কন দ্বীপে আর ফিরতে পারবে কিনা কে জানে!

এগিয়েই চলেছে বন-অ্যাডভেঞ্চার। ছল-ছল-ছলাৎ করে নৌকোর গায়ে চাপড়

পড়ছে ঢেউয়ের। হঠাৎ নিশাচর পাখির দূরাগত আওয়াজে চমকে মুখ তুলে চাইল পেনক্র্যাফট। হাল ধরে বসে ছিল সে। রাতের বেলা তো দূর সাগরে উড়ে বেড়ায় না নিশাচর পাখি! ভাল করে এদিক ওদিক চেয়েই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আলো, আলো দেখা যাচ্ছে!'

'কোথায়! কোথায় আলো?' সমস্বরে জানতে চাইল হার্বার্ট আর স্পিলেট।

হাত তুলে দেখাল পেনক্র্যাফট। উত্তর-পুবে মাইল বিশেক দূরে একটা উজ্জ্বল নীলচে সাদা আলো থেকে থেকেই ঝিকিয়ে উঠছে। এ কিসের আলো? দেখেতো মনে হয় ইলেকট্রিক টর্চ জ্বালাচ্ছে কেউ। আশ্চর্য! তবু ওদিকেই নৌকো চালাল পেনক্র্যাফট। ভোর হতেই দিগন্তে দ্বীপের সীমারেখা দেখা গেল। লিঙ্কন দ্বীপ।

চব্বিশ

বিশে অক্টোবর সকাল সাতটায় মার্সি নদীর মুখে এসে নোঙর ফেলল বন-অ্যাডভেঞ্চার। ওদের ফিরতে দেরি হওয়ায় দারুণ দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন ক্যাপ্টেন। নেবসহ প্রসপেক্ট হাইটের চূড়ায় উঠে তখন সাগরের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন তিনি। বন-অ্যাডভেঞ্চারকে আসতে দেখেই নদীর দিকে ছুটে গেলেন দু'জনে।

কিন্তু ডেকের ওপর তো নতুন কেউ নেই! নির্বাসিত লোকটাকে পাওয়া যায়নি তাহলে! নাকি ট্যাবর দ্বীপ ছেড়ে আসতে রাজি হয়নি লোকটা? সঙ্গীরা নৌকো থেকে নামার আগেই জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, 'এত দেরি করলে কেন তোমরা?'

'সে অনেক কথা, গ্র্যানাইট হাউসে ফিরেই বলব,' উত্তর দিলেন স্পিলেট।

'লোকটাকে পাওয়া যায়নি তাহলে?'

'গেছে। কিন্তু ওকে আর এখন ঠিক লোক বলা যায় না। অবস্থা দেখে মনে হয় অনেকদিন ধরেই এরকম।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। এ অবস্থায় বোতলের কাগজটা ও লিখল কি করে?' বলল হার্বার্ট।

কথাটার উত্তর দিতে পারল না কেউ। এক মুহূর্ত চুপ থেকে ক্যাপ্টেন লোকটাকে বের করে আনতে বললেন। মাথা নিচু করে নৌকো থেকে নেমে এল লোকটা। এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলেন ক্যাপ্টেন। চমকে মুখ তুলে চাইল লোকটা। নৌকো থেকে নামার পর একটু অস্থির হয়ে উঠেছিল সে, কিন্তু ক্যাপ্টেনের ব্যক্তিত্বপূর্ণ চোখের দিকে চেয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গেল।

অল্পক্ষণেই অনেক কিছু বুঝে নিলেন ক্যাপ্টেন। ওই নরপশুটার ভেতরের মনুষ্যত্ব এখনও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। ছিটেফোঁটা এখনও আছে। সেবা যত্নে ভাল হয়ে উঠবে বলে মনে হয়।

লোকটাকে নিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এল অভিযাত্রীরা। খিদে পেয়েছিল সবারই। তাড়াতাড়ি রান্নাটা সেরে নিল নেব। খেতে বসে তর্কের ঝড় উঠল লোকটাকে নিয়ে। যদি ব্রিটানিয়া জাহাজের নাবিক হয় ও, তাহলে নিশ্চয় ইংরেজ বা আমেরিকান।

'লোকটার সাথে তোমার দেখা হলো কি করে, হার্বার্ট?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'বাঁধাকপি তুলছিলাম আমি। এতই মগ্ন ছিলাম কাজে, আমার ওপর ও ঝাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত টেরই পাইনি।'

'একদিক দিয়ে অবশ্য ভালই হয়েছে। তোমাকে আক্রমণ না করলে ওর দেখাই পাওয়া যেত না।'

এভাবে আলোচনার মধ্যে দিয়েই শেষ হলো খাওয়ার পালা। মার্সি নদীর দিকে আবার রওনা দিল সবাই। নৌকোর জিনিসপত্র এখনও নামানো হয়নি।

ওয়োর দুটো আর ট্যাবর আইল্যাণ্ডে পাওয়া জিনিসগুলো একে একে নৌকো থেকে নামানো হলে খালি নৌকো নিয়ে পোর্ট বেলুনের দিকে রওনা হয়ে গেল পেনক্র্যাফট। বন-অ্যাডভেঞ্চারকে ওখানে রেখে ফিরে আসবে সে।

ওয়োর দুটো খোঁয়াড়ে রেখে অন্যান্য মালপত্র সহ গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে চলল আর সবাই। ফেরার পথে জিজ্ঞেস করলেন স্পিলেট, 'একটা ইলেকট্রিক টর্চও তাহলে বানিয়ে ফেলেছেন, ক্যাপ্টেন?'

'ইলেকট্রিক টর্চ!' একটু অবাক হলেন ক্যাপ্টেন।

'কেন, কাল রাতে ওটা জেলেই তো সঙ্কেত দিলেন আমাদের। ওই আলোর সঙ্কেত না পেলে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডকে খুঁজে পেতাম কিনা সন্দেহ।'

পাঁই করে স্পিলেটের দিকে ঘুরলেন ক্যাপ্টেন, 'কি হয়েছে খুলে বলুন তো আমাকে?'

এবার আশ্চর্য হলেন স্পিলেটও। ক্যাপ্টেনকে সব কথা বলতেই আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন, 'হুঁ। এতসব রহস্যের সমাধান কবে হবে কে জানে!'

অল্প ক'দিনের ভেতরই অনেক পরিবর্তন হলো লোকটার। রান্না করা মাংস দিলে এখন আর ঠেলে সরিয়ে দেয় না। ঘুমন্ত অবস্থায় ওর চুল দাড়ি কেটে ফেলল হার্বার্ট। চেহারার জংলী ভাবটা দূর হয়ে গেল। ভাল জামাকাপড় পরিয়ে দেবার পর পুরোপুরি ভদ্র দেখা গেল। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থাকে লোকটা, কারও সাথে কোন কথা বলে না।

রোজই ওর অবস্থার উন্নতির জন্যে কিছু না কিছু করেন ক্যাপ্টেন। ওর সামনেই আর সবার সাথে নানা ব্যাপারে—বিশেষ করে নৌবিদ্যার কথা আলোচনা করেন তিনি। নাবিক হলে এসব কথায় চঞ্চল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

কান খাড়া করে সব কথা শোনে আগন্তুক। মুখ দেখে মনে হয় কথাগুলোর মানেও বুঝতে পারছে সে। কিন্তু কথা বলে না। দিনরাত বিষণ্ন হয়ে কি যেন ভাবে ও। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল সবার কাছে—ক্যাপ্টেনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছে সে।

সুযোগটা কাজে লাগালেন ক্যাপ্টেন। একদিন আগন্তুককে জঙ্গলের ধারে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করলেন তিনি। বাধা দেবার চেষ্টা করলেন স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট।

স্পিলেট বললেন, 'ও কাজই করবেন না, ক্যাপ্টেন! জঙ্গলের কাছে গেলেই পালাবে ও।'

পেনক্র্যাফটও সে কথায় সায় দিল।

'আমার তা মনে হয় না।' বলেই লোকটার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন। ওঁর সাড়া পেয়ে মুখ তুলে চাইল আগন্তুক। মৃদু হেসে বললেন ক্যাপ্টেন, 'এসো আমার সাথে।'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে উঠে দাঁড়াল আগন্তুক। রওনা দিল ক্যাপ্টেনের পেছন পেছন। একটু দূর থেকে ওদেরকে অনুসরণ করে চলল পেনক্র্যাফট আর স্পিলেট।

প্রসপেক্ট হাইটের কাছ থেকে শুরু হয়েছে জঙ্গল। সেখানেই নিয়ে যাওয়া হলো আগন্তুককে। সামনে অগভীর খাল, একপাশে গভীর জঙ্গল। একটু অস্থির হয়ে উঠল আগন্তুক। কাঁপছে পা দুটো। মনে হলো লাফিয়ে পড়বে খালের পানিতে। কিন্তু না, পিছিয়ে এসে ধপ করে ঘাসের ওপর বসে পড়ল সে। দু'চোখে অশ্রুর ঢল।

এগিয়ে গিয়ে আগন্তুকের পাশে বসলেন ক্যাপ্টেন। আলতো করে একটা হাত রাখলেন ওর কাঁধে।

এরপর থেকে আরও বদলে গেল আগন্তুক। অভিযাত্রীদের সাথে কাজ করতে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে এখন। ওরা না বললেও মাঝে মাঝেই এটা ওটা ধরে ওদের সাহায্য করার চেষ্টা করে সে।

একদিন লোকটার ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াল পেনক্র্যাফট। ঘরের ভেতর একা একা বিড় বিড় করছে লোকটা, 'এখানে থাকার যোগ্য না আমি, কিছুতেই না।'

মনে হয় কোন সাঙ্ঘাতিক পাপ করেছে লোকটা। অনুতাপে এখন তাই জ্বলে পুড়ে মরছে। একদিন মাটি কোপাতে কোপাতে হঠাৎ কোদাল ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল আগন্তুক। আড়াল থেকে ওর ওপর নজর রাখছিলেন ক্যাপ্টেন। দেখলেন, দূর সাগরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ঝর ঝর করে কাঁদছে লোকটা।

কাছে গিয়ে আগন্তুকের পিঠে হাত রাখলেন তিনি। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'এদিকে তাকাও। আমার চোখের দিকে।'

আস্তে করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের চোখে চোখ রাখল আগন্তুক। ভাবের পর ভাব খেলে গেল ওর চেহারায়, একবার যেন পালাতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। তারপর বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন করল, 'কে আপনারা?'

'তোমার মতই নির্বাসিত,' মৃদু হাসলেন ক্যাপ্টেন, 'এখন থেকে আমরা এক সাথেই থাকব।'

'কিন্তু আমি তো, আমি তো আপনাদের সাথে থাকার যোগ্য নই। চলে যান, আমার কাছ থেকে চলে যান, ক্যাপ্টেন।' ক্যাপ্টেনের সামনে থেকে সরে গেল সে। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল দূর সাগরের দিকে।

ক্যাপ্টেনের মুখে খবরটা শুনে স্পিলেট বললেন, 'আমি হলপ করে বলতে পারি, ক্যাপ্টেন, নিশ্চয়ই কোন সাঙ্ঘাতিক পাপ করেছে ও।'

'করেছে যেমন, শাস্তিও পেয়েছে।'

অনেকক্ষণ সাগরের কূলে উদভ্রান্তের মত ঘুরে ঘুরে ফিরে এল আগন্তুক ক্যাপ্টেনের সামনে এসে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল। একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা ইংরেজ, স্যার?'

'আমেরিকান।' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন।

'তাহলে ভালই।'

'তোমার দেশ কোথায়?'

'ইংল্যাণ্ড।' বলে আবার চলে গেল আগন্তুক। আরও কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে এসে হার্বার্টকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ মাস চলছে এখন?'

'নভেম্বর।'

'সাল?'

'আঠারোশো ছেষট্টি।'

'বারো বছর, ঠিক বারো বছর পেরিয়ে গেল,' বলেই আবার ছুটে চলে গেল

আগন্তুক।

'বারোটি বছর একা কাটিয়েছে ও ট্যাবর আইল্যাণ্ডে,' হার্বার্টের কাছে সব কথা শুনে বললেন ক্যাপ্টেন, 'বদ্ধ পাগল হয়ে যায়নি তাই তো আশ্চর্য!'

'নিশ্চয়ই কোন গুরতর কুকাজের জন্যে ওকে নির্বাসিত করা হয়েছিল,' পেনক্র্যাফট বলল।

'ঠিক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তবু মুক্তির আশায় বোতলে কাগজ ভরে সাগরে ভাসিয়েছিল সে।'

'তাহলে অমানুষ হয়ে যাবার আগেই কাগজটা লিখে বোতলে ভরে পানিতে ফেলেছিল সে,' স্পিলেট বললেন

'উঁহু। অতদিন পানিতে থাকলে বোতলের কাগজ নষ্ট হয়ে যেত। একেবারে শুকনো অবস্থায় কাগজটা পেয়েছি আমরা ক্যাপ্টেন, কি বলেন?' পেনক্র্যাফট জিজ্ঞেস করল।

চুপ করে থাকলেন ক্যাপ্টেন। জবাব দিতে পারলেন না। তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন না বোতলে ভরা কাগজটা এমন শুকনো অবস্থায় নৌকোর গায়ে এসে ভিড়ল কি করে! রহস্যের পর রহস্য ঘটে চলেছে এই আজব দ্বীপে, কিন্তু কোনটারই সমাধান হচ্ছে না।

আবার বোবা হয়ে গেছে আগন্তুক, খানিকটা অ-প্রকৃতিস্থও। চুপচাপ কোথাও বসে থাকে অথবা একা একাই ঘুরে বেড়ায় সাগর তীরে, ঝোপ, জঙ্গলে, পাহাড়ে। শাকসব্জি, ফলমূল খেয়েই কাটায়। রাতের বেলা পাহাড়ের গুহায় শুয়ে থাকে। গ্র্যানাইট হাউসের ধারে কাছেও আসে না। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে ওকে কোনরকম বাধা দিল না অভিযাত্রীরা। একদিন না একদিন ঠিক হয়ে যাবেই ও।

নভেম্বরের দশ তারিখে, সন্ধ্যা আটটায় হঠাৎ প্রসপেক্ট হাইটের বারান্দায় ঝড়ের মত উদয় হলো আগন্তুক। অভিযাত্রীরা তখন বিশ্রাম করছে ওখানে। এসেই চেঁচাতে শুরু করল, 'জানেন আমি কে? কি অপরাধে নির্বাসিত হয়েছিলাম ট্যাবর আইল্যাণ্ডে? জানেন আমি চোর-ডাকাত-খুনে কিনা?'

আস্তে করে ওর কাছে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন। দ্রুত পিছু হটে গেল আগন্তুক, 'ছোঁবেন না আমাকে। শুধু একটা কথা শুনতে চাই। আমি এখানে স্বাধীন, না বন্দী?'

'স্বাধীন।'

'বেশ। তাহলে স্বাধীন ভাবেই চলব আমি।' এক ছুটে গিয়ে সামনের জঙ্গলে ঢুকে হারিয়ে গেল আগন্তুক।

পেনক্র্যাফট, হার্বার্ট আর নেব ওর পেছন পেছন যেতে চাইল, কিন্তু বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন, 'ওকে যেতে দাও। নিজে নিজেই ফিরে আসবে আবার।'

'আর ফিরছে না ও, ক্যাপ্টেন,' পেনক্র্যাফট বলল।

'নিশ্চয়ই ফিরবে,' জোর গলায় বললেন ক্যাপ্টেন।

দিন কেটে যাচ্ছে। নিজেদের কাজে ব্যস্ত অভিযাত্রীরা। প্রসপেক্ট হাইটের ওপর একটা উইণ্ড মিল তৈরি হলো ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মত। হাওয়ার জোরটা এখানে অনেক। ভালই চলবে উইণ্ড মিলের পাখা।

মিলটার দরকার ছিল। গমের চাষ শুরু করে দিয়েছিল অভিযাত্রীরা। শীঘ্রিই গম উঠবে। ওই গম ভেঙে আটা করতে হবে। রুটির অভাবও আর থাকছে না ওদের।

সেদিন তেসরা ডিসেম্বর। হ্রদের দক্ষিণ পাড়ে বসে বড়শি দিয়ে মাছ ধরছে হার্বার্ট। পোলট্রি হাউসে কাজ করছে নেব আর পেনক্র্যাফট। চিমনিতে বসে

স্পিলেটকে নিয়ে সাবানের জন্যে সোডা বানাচ্ছেন ক্যাপ্টেন। হঠাৎ শোনা গেল হার্বার্টের আতঙ্কিত চিৎকার, 'পেনক্র্যাফট, নেব, জলদি এসো। মেরে ফেলল, মেরে ফেলল আমাকে।'

লাফিয়ে উঠে হ্রদের তীরে ছুটল অভিযাত্রীরা। দেখল মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে হার্বার্ট। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটা জাগুয়ার। বন্দুক আনতে গ্র্যানাইট হাউসে ছুটলেন স্পিলেট। বাকি সবাই কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। ঠিক এমনি সময় ছুরি হাতে বন থেকে বেরিয়ে এল আগন্তুক। বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাগুয়ারের ওপর। লোকটার দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই।

বাধা পেয়ে খেপে গেল জাগুয়ার। হার্বার্টকে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবার আগন্তুকের ওপর। কিন্তু হার্বার্টের মত অসহায় নয় আগন্তুক। ওর হাতের তীক্ষ্ণ ধার ছুরিটা সাপের মত ছোবল মারছে জাগুয়ারের গায়ে। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল মানুষ আর জানোয়ার। শেষ পর্যন্ত ছুরিটা হৃৎপিণ্ডে ঢুকে যেতেই মারা পড়ল জাগুয়ারটা।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল আগন্তুক। অভিযাত্রীদের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল। আবার জঙ্গলে ঢুকতে যাচ্ছে সে। মাটি থেকে উঠে ওর দিকে ছুটে গেল হার্বার্ট। চেঁচিয়ে বলল, 'যেও না, দোস্ত, আজ তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।'

জাগুয়ারের থাবার আঘাতে লোকটার কাঁধের কাছটায় দারুণ ভাবে চিরে গেছে, দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে। কিন্তু কেয়ারই করছে না দুর্দান্ত লোকটা। হার্বার্টের ডাকেও থেমে দাঁড়াচ্ছে না। ছুটে গিয়ে ওর পথ আগলে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন, 'নিজের জীবন তুচ্ছ করে ছেলেটার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি, বন্ধু। চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম আমরা তোমার কাছে।'

'নিজের জীবন তুচ্ছ করেছি? কি দাম আছে আমার জীবনের?' ক্যাপ্টেনকে পাল্টা প্রশ্ন করে বসল আগন্তুক।

'নিশ্চয়ই আছে। যে মহত্ত্ব তুমি আজ দেখালে তার তুলনা নেই।'

'কিন্তু কে আপনারা? আমাকে বার বার এমন বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে চাইছেন কেন?'

'সবচেয়ে বড় কথা আমরা মানুষ, তুমিও তাই। আর পরিচয় যদি জানতে চাও তাহলে শোনো—।' সবাইকে একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। তারপর নিজের পরিচয়ও দিলেন, 'আমি ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং।'

'কোন্ সাইরাস হার্ডিং? বিখ্যাত সেই এঞ্জিনিয়ার—যাঁর নাম শোনেনি এমন লোক খুব কমই আছে?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল আগন্তুক।

'হ্যাঁ, উনিই সেই এঞ্জিনিয়ার।' ক্যাপ্টেনের হয়ে উত্তর দিলেন স্পিলেট।

'এবার বলো তো, কে তুমি?' প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

'আমাকে মাফ করুন, ক্যাপ্টেন। কোথায় আপনারা, আর কোথায় আমি! শুধু এটুকু জেনে রাখুন আমি একজন পাপী, মহাপাপী।'

পঁচিশ

এই ঘটনার পর জঙ্গলে আর ফিরে গেল না আগন্তুক. গ্র্যানাইট হাউসেও ঢুকল না। তবে গ্র্যানাইট হাউসের আশেপাশেই থাকল। আগের মতই ফলমূল খায় পাহাড়ের গুহায় রাত কাটায়। আসলে অভিযাত্রীদের এড়িয়ে চলতে চায় সে।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে। সেদিন দশই ডিসেম্বর। হঠাৎ ক্যাপ্টেনের সামনে এসে দাঁড়াল আগন্তুক। মাথা হেঁট করে বলল, 'একটা কথা বলব, স্যার?'

'নিশ্চয়ই। বলে ফেল কি বলবে?'

'খোঁয়াড়টা দেখাশোনার কেউ নেই। আমি ওখানে থাকতে চাই।'

'ওখানে তো শুধু জানোয়ারদের থাকার ব্যবস্থা আছে। তুমি থাকবে কি করে?'

'পারব। ওটাই আমার জন্যে উপযুক্ত জায়গা।'

'ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছায় বাধা দেব না। এখন খোঁয়াড়ের কাছে একটা ঘর বানাতে হয়।'

'ও সব কিচ্ছু করতে হবে না।'

'তাই কি হয়? ঘর ছাড়া থাকবে কোথায়?'

দিন সাতেকের ভেতরই খোঁয়াড়ের পাশে একটা সুন্দর ছোট্ট ঘর তৈরি হয়ে গেল। আরামদায়ক আসবাবপত্র থেকে শুরু করে বন্দুক পর্যন্ত সবই দেয়া হলো ওই ঘরে। এসবের কিছুই জানানো হলো না আগন্তুককে।

সব আয়োজন শেষ হলো বিশে ডিসেম্বর। ঠিক হলো সেদিন থেকেই ওই ঘরে থাকতে যাবে আগন্তুক। সন্ধ্যা আটটার দিকে গ্র্যানাইট হাউসে গল্প করছে অভিযাত্রীরা, সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকল আগন্তুক। একটু ইতস্তত করে বলল, 'জীবনের সমস্ত পাপকাহিনী আজ আপনাদের শোনাব বলে ঠিক করেছি আমি।'

'নাই বা বললে সে কথা,' বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন।

'না, আজ আমাকে সব কথা বলতেই হবে।'

'ঠিক আছে, বলো তাহলে।'

'না, এভাবে দাঁড়িয়েই বলতে পারব।'

বাইরে তখন ঝড়ের তাণ্ডব। ফায়ার প্লেসের আগুনটা আর একটু উস্কে দিল পেনক্র্যাফট। দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে চুরি করে আসা হাওয়ায় মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছে টেবিলে রাখা মোমবাতির আলো। এক আবছা আলো আঁধারি সৃষ্টি হয়েছে সারাটা ঘর জুড়ে। ঘরের এক কোণে দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে দাঁড়াল রহস্যময় আগন্তুক। ওর কাহিনী শোনার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে অভিযাত্রীরা। একবার কেশে নিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে কথা শুরু করল আগন্তুক, 'আঠারোশো চুয়ান্ন সালের বিশে ডিসেম্বর। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে বারমূলি অন্তরীপে এসে নোঙর ফেলল ছোট্ট একটা জাহাজ। জাহাজেই আছেন জাহাজের মালিক ধনী স্কটল্যাণ্ডার লর্ড গ্লেনারভন। সঙ্গে লেডী গ্লেনারভন, একজন ব্রিটিশ আর্মি মেজর, একজন ফরাসী জিওলজিস্ট, আর জনৈক ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টের অল্প বয়স্ক দুটি ছেলে-মেয়ে। বছর খানেক আগে সাগরে নিখোঁজ হয়েছে ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টের জাহাজ ব্রিটানিয়া।

'লর্ড গ্লেনারভনের ছোট্ট জাহাজ ডানকানের ক্যাপ্টেন জন ম্যাঙ্গলস। খালাসী-কর্মচারীর সংখ্যা সব মিলিয়ে জনা পনেরো। মাস ছয়েক আগে আইরিশ সাগর থেকে একটা বোতল উদ্ধার করেন জন ম্যাঙ্গলস। ইংরেজি, ফরাসী আর জার্মান ভাষায় লেখা কতগুলো কাগজ ছিল বোতলে।

'কাগজগুলো পড়ে জানা গেল, ব্রিটানিয়ার ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট আর দু'জন নাবিক বেঁচে আছেন। এক দ্বীপে আটকা পড়েছেন ওঁরা। দ্বীপের অক্ষাংশ ৩৭.১´ কিন্তু দ্রাঘিমা পড়া গেল না। পানি লেগে অস্পষ্ট হয়ে গেছে শুধু অক্ষাংশের ওপর নির্ভর করেই তাঁদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হলো।

'ব্যবস্থাটা করলেন লর্ড গ্লেনারভন। ইংল্যাণ্ডের নৌ-বিভাগ এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহ না দেখানোয় খেপে গিয়ে লর্ড গ্লেনারভন ঠিক করলেন নিজেই বেরোবেন তিনি। চিঠি লিখে ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টের ছেলে-মেয়েকে আনিয়ে নিলেন নিজের জাহাজে।

'দূর সাগর পাড়ি দিতে তৈরি হলো ডানকান। গ্লাসগো থেকে আটলান্টিকের দিকে এগিয়ে চলল জাহাজ। ম্যাগেলান প্রণালী পেরিয়ে এগিয়ে গেল প্যাটাগোনিয়া পর্যন্ত। বোতলের লেখা অনুসারে এই প্যাটাগোনিয়ার কাছেই কোথাও আটকে আছেন ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট। প্যাটাগোনিয়ার পশ্চিম উপকূলে আরোহীদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ডানকান। এখান থেকে পায়ে হেঁটে এগোবে আরোহীরা। পূর্ব উপকূলের কোরিয়েন্টিজ অন্তরীপে আবার ওদের তুলে নেবে ডানকান।

'সাঁইত্রিশ অক্ষাংশ ধরে প্যাটাগোনিয়া ঘুরে পূর্ব উপকূলে পৌছল ডানকান, কিন্তু ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। জায়গামত পৌছে আরোহীদের তুলে নিয়ে আবার এগোল ডানকান। যাওয়ার পথে কোন দ্বীপেই ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টের খোঁজ না পেয়ে শেষকালে এই বারমূনি অন্তরীপে নোঙর ফেলল ডানকান।

'অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত দ্বীপগুলোও তন্ন তন্ন করে খুঁজতে চান লর্ড গ্লেনারভন। সহযাত্রীদের নিয়ে নেমে পড়লেন তিনি। এখানে এক আইরিশ ভদ্রলোকের বাড়ির এক চাকরের মুখে শুনলেন, থাকলে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলেই কোথাও আছেন ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল চাকরের নাম আয়ারটন, ব্রিটানিয়ার কর্মচারী। ব্রিটানিয়া জলে ডোবা পর্যন্ত সে ওই জাহাজেই ছিল। ওর কাগজপত্রেও প্রমাণ পাওয়া গেল সত্যিই সে ব্রিটানিয়ার কর্মচারী ছিল।

'লোকটা আরও বলল, ওর বিশ্বাস জাহাজডুবির পর ও একাই বেঁচেছে। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে ডুবেছে ব্রিটানিয়া, কাজেই ওখানেই খুঁজতে হবে ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টকে।

'আয়ারটনের কথা বিশ্বাস করলেন লর্ড গ্লেনারভন। ঠিক হলো আরোহীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আয়ারটন। স্থলপথেই রওনা দিল ওরা ডানকানকে নিয়ে মেলবোর্নের দিকে চলে গেল জাহাজের সেকেণ্ড অফিসার টম অস্টিন, সেখানেই আবার জাহাজে উঠবে আরোহীরা। সেদিন আঠারোশো পঞ্চান্ন সালের তেইশে ডিসেম্বর।

'আসলে আয়ারটন লোকটা ছিল ভয়ঙ্কর এক শয়তান। ব্রিটানিয়ায় সত্যিই কাজ করত, কিন্তু একবার গভীর সমুদ্রে নাবিকদের নিয়ে বিদ্রোহ করে জাহাজ দখলের চেষ্টা করে সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-প্রচেষ্টা কেঁচে যায়, শাস্তিস্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে তাকে নামিয়ে দিয়ে যান ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট। তারপরই হয়তো ডুবে যায় ব্রিটানিয়া। খবরটা প্রথম শুনল সে লর্ড গ্লেনারভনের মুখে।

'ব্রিটানিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে নাম পালটে বেন জয়েস হলো আয়ারটন।

কিছু জেল পালানো কয়েদি নিয়ে এক দুর্ধর্ষ দস্যুদল গড়ে তুলল সে। নিজে হলো তাদের সর্দার। কিন্তু খোঁজ খবর রাখার জন্যে আয়ারটন নামেই চাকরের কাজ নিল আইরিশ ভদ্রলোকের বাড়িতে। গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকে তার দলবল।

'লর্ড গ্লেনারভনকে দেখে এক ফন্দী আঁটল আয়ারটন। দলবল সহ লর্ড গ্লেনারভনকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি আদায় করে নিতে হবে। ডানকানের প্রতি পত্র পাওয়া মাত্র অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে চলে যাবার নির্দেশ থাকবে চিঠিতে। কারণ সেখানেই দস্যুদল নিয়ে ডানকানকে দখল করার সুবিধে পাবে আয়ারটন।

'গভীর জঙ্গলের খাদ্য আর পানিশূন্য এক জায়গায় পৌঁছে গ্লেনারভনের কাছ থেকে সত্যিই একটা চিঠি আদায় করল আয়ারটন। চিঠিতে টম অস্টিনকে হুকুম দিয়েছেন লর্ড গ্লেনারভন—চিঠি পাওয়া মাত্রই যেন টুফোল্ড উপসাগরের দিকে চলে যায় ডানকান। গভীর জঙ্গলের ওই জায়গা থেকে মাত্র কয়েকদিনের পথ টুফোল্ড উপসাগর।

'দু'দিনেই লর্ড গ্লেনারভনের চিঠি নিয়ে মেলবোর্ন পৌঁছে গেল আয়ারটন। চিঠি পেয়ে সাথে সাথেই জাহাজ ছেড়ে দিল টম অস্টিন। কিন্তু টুফোল্ড উপসাগরের দিকে না গিয়ে সে রওনা দিল নিউজিল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলের দিকে। রেগে গেল আয়ারটন। তার সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট হতে বসেছে ওদিকে যাচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করলে চিঠি খুলে দেখাল টম। স্তব্ধ হয়ে গেল আয়ারটন। নিউজিল্যাণ্ডের দিকেই জাহাজ চালাবার নির্দেশ আছে চিঠিতে। ভুল করে টুফোল্ডের জায়গায় নিউজিল্যাণ্ড লিখে ফেলেছেন তিনি।

'দেখেশুনে মাথা খারাপ হয়ে গেল আয়ারটনের। টমকে যাচ্ছে তাই গালিগালাজ শুরু করল সে, এমন কি মারতে পর্যন্ত গেল। বাধ্য হয়ে আয়ারটনকে লোহার চেন দিয়ে বেঁধে রাখল টম।

'তেসরা মার্চ জায়গামত পৌঁছে গেল ডানকান কামানের আওয়াজ করে সঙ্কেত জানাল টম। অল্প পরেই দলবল সহ এসে জাহাজে উঠলেন লর্ড গ্লেনারভন। কিন্তু ওঁর যদি টুফোল্ডের দিকে যাবার কথা, এখানে এলেন কি করে!

'গভীর জঙ্গলে গ্লেনারভনকে ফেলে চলে আসে পথ প্রদর্শক আয়ারটন। বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত টুফোল্ডে পৌঁছান গ্লেনারভন। কিন্তু ডানকান নেই, আসেইনি সেখানে। মেলবোর্নে টেলিগ্রাম করে জানলেন, আঠারোই মার্চ মেলবোর্ন ছেড়ে গেছে ডানকান। কোথায় গেছে বলে যায়নি।

'সন্দেহ দেখা দিল গ্লেনারভনের মনে। কোন উপায়ে ডানকানকে দখল করে কি পালাল আয়ারটন? কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন গ্লেনারভন। একটা সদাগরী জাহাজ ভাড়া করে এগিয়ে চললেন সাঁইত্রিশ অক্ষাংশ বরাবর, পৌঁছলেন নিউজিল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পূর্ব উপকূলে এসে সাক্ষাত পেলেন ডানকানের।

'বন্দী আয়ারটনকে গ্লেনারভনের সামনে আনা হলো। অনেক রকম চেষ্টা করেও কথা বের করা গেল না আয়ারটনের পেট থেকে। শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাতে দেবার ভয় দেখানোয় মুখ খুলল আয়ারটন। তবে এক শর্তে। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দিতে হবে তাকে।

'লর্ড গ্লেনারভন রাজি হতেই এক এক করে সব বলে দিল আয়ারটন—ব্রিটানিয়ার বিদ্রোহ, ওর দস্যুদল গঠন, সব। তবে ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট কোথায় আছেন সত্যিই জানে না সে। কথা রাখলেন লর্ড গ্লেনারভন। সাঁইত্রিশ অক্ষাংশ বরাবর চলতে চলতে তিনি হাজির হলেন প্রশান্ত মহাসাগরের এক ছোট্ট দ্বীপে। ভাগ্যক্রমে

ওই দ্বীপেই পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট আর তাঁর দুই সঙ্গীকে। ওঁদেরকে ডানকানে তুলে নিয়ে ওই দ্বীপেই নামিয়ে দেয়া হলো আয়ারটনকে। ওটাই ট্যাবর আইল্যান্ড।

'যাবার সময় বলে গেলেন গ্লেনারভন—"লোকালয় থেকে দূরে থাকবে তুমি, আয়ারটন। যদিও তোমার মত লোককে মনে রাখা উচিত নয়, তবু তুমি কোথায় থাকছ ভুলব না আমি।" আঠারোশো পঞ্চান্ন সালের আঠারোই মার্চ আয়ারটনের চোখের সামনে দিগন্তে মিলিয়ে গেল ডানকান।

'ট্যাবর আইল্যান্ডে একা পড়ে থাকল আয়ারটন। দ্বীপে ফসল, বন্দুক, গুলিবারুদ, যন্ত্রপাতি সবই আছে। আছে ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টের তৈরি কুঁড়েঘরটাও। প্রায়শ্চিত্ত শুরু হলো আয়ারটনের। তীব্র অনুশোচনায় পাগলের মত বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে আয়ারটন, সারাক্ষণ প্রার্থনা করেছে খোদার কাছে। কিন্তু নির্জনতার অভিশাপ মুক্তি দিল না ওকে। টের পেল আয়ারটন, আস্তে আস্তে বুনো হিংস্র পশু হয়ে যাচ্ছে সে। কয়েক বছর পরে সত্যিই মনুষ্যত্ব হারাল আয়ারটন। সেই মনুষ্যত্ব হারানো পশুটাকেই ট্যাবর দ্বীপ থেকে আপনারা তুলে এনেছেন, ক্যাপ্টেন।'

আয়ারটনের কথা শেষ হবার পরও কেউ কোন কথা বলতে পারল না। মোমের আলোয় ঘরের দেয়ালে পড়া অভিযাত্রীদের ছায়াগুলো লাগছে অশরীরি প্রেতের মত বাইরে তখনও শান্ত হয়নি ঝড়।

বহুক্ষণ পর মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে দাঁড়াল অভিযাত্রীরা। নীরবতা ভাঙলেন ক্যাপ্টেন, 'আয়ারটন, তুমি পাপ করেছিলে, শাস্তি পেয়েছ। পাপের প্রায়শ্চিত্তও হয়ে গেছে। এখন থেকে নিজেকে আমাদের একজন বলেই ভাববে।'

ঘরের কোণ থেকে ছুটে এসে ক্যাপ্টেনের হাত চেপে ধরল আয়ারটন। কথা বলতে গিয়েও পারল না। আবেগে কেঁপে উঠল ঠোঁট দুটো।

'আমাদের সাথে গ্র্যানাইট হাউসেই থাকো তুমি,' আবার বললেন ক্যাপ্টেন।

'কিছুদিন অন্তত আমাকে খোঁয়াড়ে থাকতে দিন, ক্যাপ্টেন।'

'ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা বলো তো, নির্জনেই যদি থাকতে চাও বোতলে ভরে কাগজের টুকরোটা পাঠিয়েছিলে কেন?'

'কাগজ পাঠিয়েছিলাম?' বিস্মিত হলো আয়ারটন।

'সেই কাগজটা পেয়েই তো ট্যাবর আইল্যান্ডে যায় বন অ্যাডভেঞ্চার। ট্যাবর আইল্যান্ডের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমা আর তোমার কথা লেখা ছিল ওতে।'

'কিন্তু ওরকম কোন কাগজই সাগরে ভাসাইনি আমি।'

'শিওর?'

'শিওর।'

'আর কিছু বলার নেই আমার। খোঁয়াড়ের দিকে রওনা হতে পারো এখন।'

ছাব্বিশ

ভোর হতেই খোঁয়াড়ের দিকে রওনা দিল অভিযাত্রীরা। রাতটা খোঁয়াড়ে কি ভাবে কাটাল আয়ারটন দেখা দরকার। খোঁয়াড়ে এসে দেখল ওরা বহাল তবিয়তেই আছে আয়ারটন। গতরাতে ঠিক মতই পৌঁছে গেছে সে এখানে।

ফেরার পথে বোতলের ব্যাপারে নিজের সন্দেহের কথাটা স্পিলেটকে খুলে

বললেন ক্যাপ্টেন। সব শুনে স্পিলেট বললেন, 'ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। আপনার কি মনে হয়, ক্যাপ্টেন?'

'এটাও এ দ্বীপের অনেক রহস্যের একটা। তবে শেষ পর্যন্ত এসব রহস্যের সমাধান আমি করবই। তার জন্যে যদি আমাকে লিঙ্কন দ্বীপের পাতালেও যেতে হয়, তাই যাব।'

দেখতে দেখতে এসে গেল আর একটা নতুন বছর। জানুয়ারির প্রথমেই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারলেন ক্যাপ্টেন। খোঁয়াড় থেকে গ্র্যানাইট হাউসে যাতে মুহূর্তে খবর পাঠানো যায় সে ব্যবস্থা করলেন, অর্থাৎ টেলিগ্রাফ বসালেন। প্রথমে কথাটা শুনে তো সবাই অবাক। হার্বার্ট তো জিজ্ঞেসই করে বসল, 'ব্যাটারি পাবেন কোথায়?'

'অন্যান্য জিনিসপত্র যেভাবে পেয়েছি,' নির্লিপ্ত জবাব ক্যাপ্টেনের। 'বানিয়ে নেব। ব্যাটারির কেমিক্যালস সবই আছে দ্বীপে। শুধু তারটা বানিয়ে নিলেই হলো।'

'ঠিক বলেছেন। আর ক'দিন পর তাহলে এঞ্জিনটা বানিয়ে নিলেই হলো। রেলগাড়িও চড়া যাবে। আচ্ছা, আপনার অভিধানে কি অসম্ভব বলে কোন কথা নেই, ক্যাপ্টেন?' প্রশ্ন করল পেনক্র্যাফট।

উত্তরে মুচকি হাসলেন ক্যাপ্টেন।

প্রথমেই তৈরি হলো তার। লোহার অভাব নেই দ্বীপে। ওই লোহা দিয়ে কতগুলো কাঠি বানানো হলো। একটা কঠিন ইস্পাতের পাত বানিয়ে তাতে তিন পরিধির তিনটে ছিদ্র করা হলো। স্যাকরারা যেভাবে সোনা রূপার তার লম্বা করে, সেভাবে প্রথমে বড়, তারপর মাঝের ও সবশেষে ছোট ছিদ্রটা দিয়ে লোহার কাঠিগুলো টেনে হিঁচড়ে বের করার পর লম্বা হয়ে গেল কাঠিগুলো। এক একটা কাঠি থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট লম্বা তার পাওয়া গেল। তারগুলো পর পর জুড়ে নিয়ে গ্র্যানাইট হাউস থেকে খোঁয়াড় পর্যন্ত পাঁচ মাইল লম্বা টেলিগ্রাফের তার তৈরি হয়ে গেল। তামা দিয়ে এই পদ্ধতিতে কিছু সরু তারও বানানো হলো।

এবার ব্যাটারি। দুই মুখো কাঁচের বোতলে নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে কাঁচের নল ডুবিয়ে দেয়া হলো ওতে। নলের একমুখ ছিদ্র করা মাটির ছিপি দিয়ে বন্ধ করে ছিদ্র দিয়ে ঢালা হলো পটাশ সলিউশন। কিছু বিশেষ গাছপালা পুড়িয়ে ছাই করে তা থেকে আগেই পটাশ বানিয়ে নিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন। পটাশ আর নাইট্রিক অ্যাসিডের যোগাযোগ হলো মাটির ছিপির মধ্য দিয়ে। এরপর দুটো দস্তার পাত নিয়ে একটা অ্যাসিডে, অন্যটা পটাশে ডুবিয়ে দেয়া হলো। অ্যাসিডের পাতটা নেগেটিভ আর পটাশের পাতটা পজিটিভ। তার দিয়ে দুটো পাতকে যুক্ত করে দিতেই চালু হয়ে গেল বিদ্যুৎ প্রবাহ।

খোঁয়াড় থেকে গ্র্যানাইট হাউস পর্যন্ত খুঁটি বসিয়ে তার টাঙানো হলো খুঁটির মাথায়। সেকেণ্ডে বিশ হাজার মাইল বেগে কারেন্ট চলবে এই তারের মধ্য দিয়ে। নরম লোহায় তামার তার জড়িয়ে বৈদ্যুতিক চুম্বক বানানো হলো। কারেন্ট চালু করলেই কাজ শুরু করবে বৈদ্যুতিক চুম্বক। খটা খট আওয়াজ করে চলতে থাকবে টেলিগ্রাফ। কথাবার্তা চলবে টরে টক্কা পদ্ধতির মোর্স কোডে।

মহাসমারোহে টেলিগ্রাফ উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হলো বারোই ফেব্রুয়ারি। গ্র্যানাইট হাউস থেকে খোঁয়াড়ে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন, 'ঠিক আছে সব?'

সাথে সাথেই খোঁয়াড় থেকে উত্তর দিল আয়ারটন, 'সব ঠিক, ক্যাপ্টেন।'

ব্যাপার দেখে খুশিতে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল পেনক্র্যাফট। তারপর

থেকে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে রোজ আয়ারটনের খবরাখবর নিতে লাগল পেনক্র্যাফট। ফলে নিঃসঙ্গ থাকতে চাইলেও তা আর থাকতে পারল না আয়ারটন।

সিন্দুকের ক্যামেরাটার কথা এতদিন ভুলেই গিয়েছিল অভিযাত্রীরা। হঠাৎ স্পিলেটের মনে হলো কথাটা। সাথে সাথেই সেটা বের করে এটা ওটার ফটো তুলতে শুরু করলেন তিনি। সবচেয়ে সুন্দর উঠল জাপের ফটোটা।

একটা মজার ব্যাপার ঘটল একুশে মার্চ। সেদিন ভোরে গ্র্যানাইট হাউসের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই চমকে উঠল হার্বার্ট। বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কি শুরু হলো এই হতচ্ছাড়া দ্বীপটায়, অ্যাঁ! এই মার্চের শেষে কিনা বরফ পড়ছে!'

মার্সি নদীর ধার থেকে সাগর তীর পর্যন্ত বরফে সাদা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি থার্মোমিটার দেখল সে। কিন্তু টেম্পারেচার তো ঠিকই আছে। নাকি নিজেই পাগল হয়ে গেল সে? কি দেখতে কি দেখছে? পেনক্র্যাফটকে ডেকে দৃশ্যটা দেখাল সে।

ব্যাপার দেখে নিচে নামতে গেল পেনক্র্যাফট। কিন্তু ওর আগেই নিচে নেমে গিয়ে মার্সি নদীর দিকে ছুটতে শুরু করল জাপ। জাপকে দেখেই মাটিতে ছড়িয়ে থাকা তুষার একটা বিশাল সাদা চাদর হয়ে আকাশে উঠে গেল। আস্তে আস্তে চাদরটা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সারা আকাশে।

'শা-আ-লা!' ফোঁস করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসটা ছাড়ল হার্বার্ট, 'এ যে দেখছি পাখির ঝাঁক! আসলে তুষার-সাদা একজাতের সামুদ্রিক পাখি ওগুলো।

ছাব্বিশে মার্চ। লিঙ্কন দ্বীপে অভিযাত্রীদের আসার পর পুরো দুটো বছর পার হয়ে গেছে। দু'বছরে কত ঘটনাই ঘটে গেছে পৃথিবীতে। পরিবর্তন হয়েছে লিঙ্কন দ্বীপবাসীদেরও। কিন্তু এই দু'বছরে একটা জাহাজেরও দেখা পায়নি ওরা।

একদিন না একদিন ট্যাবর আইল্যাণ্ডে নির্বাসিত আয়ারটনকে তুলে নেবার জন্যে আসবেই ডানকান। সে রকম আভাসই দিয়ে গেছেন লর্ড গ্লেনারভন। আয়ারটন লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে এসেছে প্রায় পাঁচ মাস। কে জানে এই পাঁচ মাসের ভেতরই এসে ফিরে গেছে কিনা ডানকান। তবুও একটা নোটিশ লিখে ট্যাবর আইল্যাণ্ডে গিয়ে আয়ারটনের লিঙ্কন দ্বীপে অবস্থানের খবরটা কুঁড়ের ভেতর সুবিধেমত জায়গায় লটকে দিয়ে আসতে হবে। যদি গত পাঁচ মাসে না এসে থাকেন লর্ড গ্লেনারভন তাহলে কাজে লাগবে নোটিশটা।

কাজে কর্মে কেটে গেল আরও কয়েকটা দিন। সেদিন পঁচিশে এপ্রিল। প্রসপেক্ট হাইটের বারান্দায় বসে আড্ডা মারছে অভিযাত্রীরা। গম্ভীর হয়ে বসে আছেন ক্যাপ্টেন। কি যেন গভীর ভাবে ভাবছেন তিনি। হঠাৎ নড়েচড়ে বসে কথা বললেন তিনি, 'সবাই এদিকে এসে বসতো, কথা আছে।'

কি বলবেন ক্যাপ্টেন? একটু অবাক হলো সবাই, কিন্তু ক্যাপ্টেনের কাছে বসল।

'এ দ্বীপে আসা ইস্তক বেশ কিছু রহস্যময় ঘটনা ঘটে গেছে। সে সম্পর্কে আলোচনা করে তোমাদের মতামত জানতে চাই।' তারপর একটু থেমে আবার বললেন, 'গোড়া থেকেই শুরু করি। বেলুন থেকে সাগরে ছিটকে পড়ে ডুবতে বসেছিলাম। কি করে তীরে এলাম জানি না। তীরে এসেই জ্ঞান হারালাম। তাহলে আমাকে গুহাটায় বয়ে নিয়েছিল কে? ওই গুহাটা থেকে তোমরা ছিলে তখন পাঁচ মাইল দূরে। অচেনা জায়গায় এতটা পথ পাড়ি দিয়ে সোজা চিমনিতে পৌঁছল কি করে টপ? আর তাও না হয় পৌঁছল, কিন্তু সাঙ্ঘাতিক ঝড় তুফানের ভেতর দিয়ে গিয়েও ওর শরীর ঝরঝরে শুকনো থাকল, আর বিন্দুমাত্র ক্লান্তও হয়নি সে।

'তারপর আসে ডুগংটার রহস্যজনক মৃত্যু। গলা কেটে কে হত্যা করেছিল

ওটাকে? কে পানির নিচ থেকে ওপরে ছুঁড়ে দিয়েছিল টপকে? কে গুলি করেছিল পেকারির বাচ্চাটাকে?

'পিপে বাঁধা সিন্দুকটা এল কোত্থেকে? জাহাজডুবি হবার আগে নিজেদের কাজে লাগবে বলে নাবিকদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঢুকিয়ে এভাবে সিন্দুক ভাসিয়ে দিতে শোনা গেছে। কিন্তু একটা জিনিসের গায়েও প্রস্তুতকারকের নাম নেই কেন?

'কাগজ ভরা বোতলটা কে ভাসিয়েছিল পানিতে? আর ভাসিয়েছিলই যদি একেবারে বন-অ্যাডভেঞ্চারের গায়ে এসে ঠেকল কি করে ওটা?

'মাঝে মাঝে কোন কিছুর অস্তিত্ব টের পেয়ে কুয়োর পাড়ে গিয়ে চেঁচায় টপ। এমন কি জাপও ব্যতিক্রম না। কি আসে কুয়োর তলায়?

'গ্র্যানাইট হাউসে কার আগমনে ভড়কে গিয়েছিল শিম্পাঞ্জীর দল? সিঁড়িটাকে ওপর থেকে নিচে ফেলেছিল কে? উল্টানো কচ্ছপটা গায়েব হলো কি করে? গাছের গুঁড়িতে বাঁধা ছোট্ট নৌকোটা ছাড়া পেল কি করে? আর ধরলাম, শক্ত করে বাঁধেনি পেনক্র্যাফট, যেভাবেই হোক বাঁধন খুলে পানিতে ভেসে যায় নৌকোটা; তাহলে অন্য কোথাও না গিয়ে একেবারে আমাদের যাত্রাপথেই এসে হাজির হলো কি করে ওটা?

'আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, কে আলোর সঙ্কেত দিয়ে বন-অ্যাডভেঞ্চারকে পথ চিনতে সাহায্য করেছিল? আর সে আলোও যে সে আলো নয়, শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলো।' একটানা এতগুলো কথা বলে হাঁপিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল শ্রোতারা। একটা কথারও উত্তর দিতে পারল না। কে সেই রহস্যময় বন্ধু? যে প্রত্যেকটা বিপদের সময় হাত বাড়িয়ে সাহায্য করছে ওদের, অথচ নিজে থেকে যাচ্ছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য? সত্যিই কি কোন শুভাকাঙ্ক্ষী, অশরীরী দেবতা বাস করছে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে? কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে এ যে ভাবাও অসম্ভব!

রহস্য রহস্যই থেকে গেল। এদিকে আবার শীত নামল লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে। এবারের শীতকে আর পাত্তাই দিল না অভিযাত্রীরা। খাবার, গরম জামাকাপড় এক কথায় শীতের সময় যা যা দরকার কোনটারই অভাব নেই ওদের, কাজেই ভাবনা কি?

একে একে কেটে গেল শীতের চারটে মাস। এল অক্টোবর। বসন্তকাল। নতুন সাজে সাজল বনভূমি। কোত্থেকে উড়ে এল হাজার হাজার পাখি। তাদের কলকাকলিতে মুখরিত সবুজ বন। এই দৃশ্যকে ক্যামেরায় ধরে রাখার ইচ্ছে হলো হার্বার্টের।

গ্র্যানাইট হাউসের জানালায় দাঁড়িয়েই প্রাকৃতিক দৃশ্যের পর পর বেশ কয়েকটা ছবি তুলল হার্বার্ট। অন্ধকার ঘরে কেমিক্যাল সলিউশনে ফটো প্লেট ধুয়ে নিয়ে ওগুলো হাতে আবার এসে দাঁড়াল জানালায়। চমৎকার উঠেছে ছবিগুলো। কিন্তু একটা ছবিতে একটু গণ্ডগোল আছে। ছবিটা সাগরের। দূর দিগন্তে আকাশ নেমে এসেছে সাগরের ওপর। ওই আকাশ-সাগরের মিলন রেখায় একটা ছোট্ট কালো দাগ। ছবির সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়েছে এই দাগটা। পানিতে ধুয়ে, হাত দিয়ে ডলে নানাভাবে দাগ তোলার চেষ্টা করল হার্বার্ট। কিন্তু উঠল না দাগটা। হঠাৎ কি সন্দেহ হতেই টেলিস্কোপ থেকে লেন্স খুলে নিয়ে দাগটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে। একটু দেখেই চমকে উঠল। ছুটে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে। ফটোর নেগেটিভ আর লেন্সটা ওঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'নেগেটিভটা একবার দেখবেন,

ক্যাপ্টেন?'

'দেখি।' হাত বাড়িয়ে জিনিসগুলো নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড ভালমত দেখলেন ক্যাপ্টেন। তারপর টেলিস্কোপ হাতে ছুটলেন খোলা জায়গাটায়। টেলিস্কোপ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ওই দিকের আকাশ আর সাগরের সঙ্গমস্থলকে। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট কালো বিন্দুটা চোখে পড়ল তাঁর। অস্ফুটে একটি শব্দই উচ্চারণ করলেন তিনি, 'জাহাজ!'

সাতাশ

এখনও প্রায় বিশ মাইল দূরে জাহাজটা। ক্রমে এগিয়ে আসছে। কোন্ দেশী জাহাজ, কাদের জাহাজ ওটা? হার্বার্ট বলল, 'ডানকান নয় তো?'

'অসম্ভব নয়,' জবাব দিলেন স্পিলেট, 'আয়ারটনকে ডেকে আনা দরকার।'

টেলিগ্রাফে খবর পেয়ে বিকেলের দিকে এল আয়ারটন। ওটা ডানকান কিনা জিজ্ঞেস করতেই আঁতকে উঠল সে, 'অসম্ভব! অত তাড়াতাড়ি আসতে পারে না ডানকান।' বলেই টেলিস্কোপটা নিয়ে চোখে লাগাল। একটু দেখেই মন্তব্য করল, 'না, ডানকান না। ডানকানের এঞ্জিন আছে, এটার নেই।'

আয়ারটনের হাত থেকে টেলিস্কোপটা নিয়ে জাহাজটার গতিবিধি দেখতে লাগল পেনক্র্যাফট। হঠাৎ জাহাজের মুখটা একটু অন্যদিকে বেঁকে গেল। দ্বীপ পেরিয়ে চলে যাবে নাকি জাহাজটা? পেনক্র্যাফট কথাটা বলতেই অস্থির হয়ে উঠলেন স্পিলেট। আগুন জ্বালিয়ে সঙ্কেত দেয়া দরকার। কিন্তু রাজি হলেন না ক্যাপ্টেন। হঠাৎ এই জাহাজের আবির্ভাবটাকে কেন যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি।

হঠাৎ আবার দ্বীপের দিকে মুখ ফেরাল জাহাজটা।

'জাহাজটা বেশ মজবুতই মনে হচ্ছে,' টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে দেখতে বলল পেনক্র্যাফট। 'ফ্ল্যাগটা আমেরিকানও না, ব্রিটিশও না। ফরাসী, জার্মান, রাশিয়া এমন কি স্পেনেরও না। তাহলে কোন···' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, 'সর্বনাশ! কালো ফ্ল্যাগ!'

চমকে উঠল অভিযাত্রীরা। কালো ফ্ল্যাগের মানে জানা আছে ওদের। জলদস্যুদের পতাকার রঙ কালো—মানে জলদস্যুদের জাহাজ ওটা। সাবধান হয়ে গেল সবাই। লিঙ্কন দ্বীপে মানুষ আছে এটা জলদস্যুদের বুঝতে দেয়া চলবে না। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে, আয়ারটন আর নেব গিয়ে উইণ্ডমিলের পাখাগুলো খুলতে লেগে গেল। দূর থেকে ওগুলোই আগে চোখে পড়ে। গ্র্যানাইট হাউসের দরজা জানালা লতাপাতা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিতে লাগল হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফট।

'নৌকোটা, মানে, বন-অ্যাডভেঞ্চারের কি হবে?' জিজ্ঞেস করল হার্বার্ট।

'কিছু হবে না।' জবাব দিল পেনক্র্যাফট, 'বন্দরটা খুঁজেই পাবে না ওরা।'

ক্যাপ্টেনের কথামত অল্প সময়েই সব কাজ শেষ করে ফেলল ওরা। দ্বীপে মানুষ আছে এটা বাইরে থেকে জলদস্যুরা সহজে বুঝতে পারবে না।

সবাইকে ডেকে জরুরী মীটিংয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন। 'যদি লিঙ্কন দ্বীপ দখল করতে চায় ওরা, কি করবে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'যুদ্ধ করব,' একসাথেই জবাব দিল সবাই। 'প্রাণ থাকতে জলদস্যুদের হাতে

দ্বীপ ছেড়ে দেব না।'

'ঠিক। যুদ্ধই করব আমরা।' ক্যাপ্টেনও সবার সাথে একমত হলেন। রাত নামতে অন্ধকারে দেখা গেল না জাহাজটাকে। সবাই আশা করছে হয়তো শেষ পর্যন্ত লিঙ্কন দ্বীপে নোঙর ফেলবে না পাইরেট শিপ। ঠিক সেই সময় সবাইকে চমকে দিয়ে সাগরের দিক থেকে ঝলকে উঠল উজ্জ্বল আলো। এর প্রায় ছয় সেকেণ্ড পরে ভেসে এল কামান দাগার বিকট আওয়াজ। কামান দেগে যেন হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে জলদস্যুরা—যদি কেউ থেকে থাকো দ্বীপে, লাগতে এসো না আমাদের সাথে। আলো আর শব্দের ব্যবধান ছয় সেকেণ্ড, মানে তীর থেকে সোয়া এক মাইল দূরে আছে জাহাজটা। আরও কিছুক্ষণ পর লোহার শেকলের ঝনঝনানি শোনা যেতেই বুঝল অভিযাত্রীরা, গ্র্যানাইট হাউসের কাছেই সাগরতীরে নোঙর ফেলছে পাইরেট শিপ।

যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। গ্র্যানাইট হাউসটা সুরক্ষিত, কিন্তু পোলট্রি, শস্যক্ষেত্র, খোঁয়াড়ের কি ব্যবস্থা করা যায়? তাছাড়া জলদস্যুরা সংখ্যায় কত তা না জেনে যুদ্ধে নামাটাও উচিত হবে না। বড় কথা হলো কামানের বিরুদ্ধে অভিযাত্রীদের ন'টা বন্দুক কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে?

'একটা কথা বলব, ক্যাপ্টেন?' হঠাৎ ক্যাপ্টেনের সামনে এসে বলল আয়ারটন।

'কি কথা?'

'জাহাজে ক'জন লোক আছে, একবার গিয়ে দেখে আসতে চাই।'

বাধা দিয়ে আয়ারটনকে নিরস্ত করা যাবে না বুঝে অনুমতি দিলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু আয়ারটন একা যাবে না, ওর সাথে পেনক্র্যাফটও যাবে। যেতেই যখন হবে দেরি করে লাভ নেই। কাজেই রওনা হয়ে গেল দু'জনে। সাগর পাড়ে পৌঁছে গায়ের সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেলে গায়ে ভাল করে চর্বি মেখে নিল আয়ারটন। এতে শীতটা কম লাগবে। এই ফাঁকে মার্সি নদীর তীর থেকে ছোট নৌকোটা নিয়ে এল পেনক্র্যাফট।

আয়ারটন উঠে বসতেই নৌকো ছেড়ে দিল পেনক্র্যাফট। দ্বীপের অন্যপ্রান্তে পৌঁছেই নৌকো থেকে পানিতে নেমে পড়ল আয়ারটন। কাছেই একটা পাহাড়ের ফাটলে আত্মগোপন করল পেনক্র্যাফট।

মিটমিটে একটা আলো জ্বলছে পাইরেট শিপের মাথায়। সেদিকেই নিঃশব্দে সাঁতরে চলল আয়ারটন। আধঘন্টার মধ্যেই জাহাজের কাছে পৌঁছে নোঙরের শিকল ধরে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল। তারপর শিকল বেয়ে উঠে গেল ডেকে। ডেকের একধারে রশিতে ঝুলানো কিছু শার্ট-প্যান্ট শুকোতে দিয়েছে খালাসীরা, অন্যধারে আড্ডা মারছে কয়েকজন জলদস্যু। কান পেতে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগল আয়ারটন। একটু পরই ওদের কথাবার্তা থেকে আবিষ্কার করল, জাহাজটার নাম 'স্পীডি'। ক্যাপ্টেনের নামটা কানে যেতেই দারুণভাবে চমকে উঠল আয়ারটন। ভাল করেই চেনে সে ক্যাপ্টেন বব হার্ডিকে। আয়ারটনেরই সহকারী ছিল বব হার্ডি। তাহলে আয়ারটন দস্যুদল ছেড়ে চলে আসার পর বব হার্ডিই ওদের সর্দার হয়েছে।

মাতালগুলোর আলোচনা থেকে আরও অনেক কথাই পরিষ্কার হলো আয়ারটনের কাছে। অস্ট্রেলিয়ার নরফোক আইল্যাণ্ডের কাছে এই জাহাজটা দখল করেছে বব হার্ডি। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব না থাকায় প্রশান্ত মহাসাগরে সাঙ্ঘাতিক রকম লুটতরাজ করছে হার্ডি। হঠাৎ করেই প্রথমবারের মত লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে হার্ডির আগমন। পছন্দ হলে এখানেই একটা গোপন ঘাঁটি বানিয়ে নেবার ইচ্ছে।

মনস্থির করে ফেলল আয়ারটন। যেভাবেই হোক হার্ডির পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে হবে। জনা পঞ্চাশেক দস্যু আছে স্পীডিতে, এটা ওদের কথা থেকেই জানতে পেরেছে আয়ারটন। এত লোকের বিরুদ্ধে ওরা মাত্র দু'জন! এতগুলো দস্যু, তার ওপর কামানের বিরুদ্ধে কি করতে পারবে অভিযাত্রীরা? সাঙ্ঘাতিক পরিকল্পনাটা ওর মাথায় ঢুকল ঠিক এই সময়। না, এতে আর দ্বিধা করবে না সে, তাতে মরতেও যদি হয় কুছ পরোয়া নেই।

উড়িয়ে দিতে হবে জাহাজটা, কোনমতে বারুদ ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারলেই হলো। বাঁচবে না আয়ারটনও, কিন্তু এতবড় পাপী হিসেবে বেঁচে থেকেই বা কি লাভ! এতে অন্তত পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে।

সাধারণত বারুদঘর থাকে জাহাজের পেছন দিকে। মাতাল জলদস্যুরা ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল আয়ারটন। তারপর পা টিপে টিপে এগোল। নানা ধরনের বন্দুক আর পিস্তল স্তূপ করে রাখা মাস্তুলের গোড়ায়। দেখেশুনে একটা পিস্তল হাতে তুলে নিল সে। বারুদঘরটা উড়াতে পিস্তলের একটা গুলিই যথেষ্ট। কিন্তু ঘরটার সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। বিশাল এক তালা ঝুলছে ঘরের দরজায়। পিস্তলটা আস্তে করে নিচে নামিয়ে রাখল আয়ারটন। দু'হাতে মুঠো করে ধরল তালাটা। গায়ের জোরে মোচড় দিতে লাগল তালায়। দর দর করে পিঠ বেয়ে নামছে ঘামের ধারা। কিন্তু ভাঙছে না দরজার তালা লাগানোর আংটা। দাঁতে দাঁত চেপে আবার তালায় মোচড় দিল সে। কট্ করে শব্দ করে ভেঙে গেল আংটা। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফেলে পিস্তলটা তুলে নিতে যাবে এমন সময় কাঁধ খামচে ধরল কেউ। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল আয়ারটন। আবছা অন্ধকারেও পরিষ্কার চিনল সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে। বব হার্ডি।

কিন্তু আয়ারটনকে চিনল না। হার্ডি। কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে তুই? কি করছিস এখানে?' বলেই আয়ারটনের চুল মুঠো করে ধরল সে।

উত্তরে ঝাঁকুনি দিয়ে চুলগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে হার্ডির নাকে ঘুসি মারল আয়ারটন। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হার্ডি, 'ডাকাত, ডাকাত পড়েছে জাহাজে!' নিজেই যে ডাকাত সে কথা বেমালুম ভুলে গেছে সে।

ধুপ ধাপ পায়ের আওয়াজ তুলে ছুটে এল জলদস্যুরা। পিস্তল তুলে গুলি করল আয়ারটন। ডেকের ওপর গড়িয়ে পড়ল দু'জন ডাকাত। আবার গুলি করতে যেতেই একটা ছুরি এসে বিঁধল আয়ারটনের ডান কাঁধে। ব্যথায় কুঁচকে গেল ওর চোখ মুখ। পিস্তলটা পড়ে গেল হাত থেকে। ওদিকে জেগে উঠেছে পুরো জাহাজ। কিন্তু মাথা গরম করল না আয়ারটন।

উবু হয়ে বাঁ হাতেই তুলে নিল সে পড়ে যাওয়া পিস্তলটা। পরমুহূর্তেই হাত তুলে গুলি করল একমাত্র লণ্ঠনটা লক্ষ্য করে। গুলি লেগে ছাতু হয়ে গেল লণ্ঠনটা। বিন্দুমাত্র দেরি না করে সিঁড়ির দিকে ছুটল আয়ারটন। পেছন পেছন আসছে তিনজন ডাকাত। আবার গুলি করল আয়ারটন। পড়ে গেল তিনজনের একজন। বাকি দু'জন ভয় পেয়ে যেদিক থেকে আসছিল সেদিকেই ছুটে পালাল। সিঁড়ি বেয়ে একছুটে ডেকে উঠে এল আয়ারটন। অনেকগুলো দস্যু ডেকে দাঁড়িয়ে হট্টগোল করছে। ওদের বুঝে উঠার আগেই রেলিংয়ের দিকে ছুটে গেল সে। এক লাফে রেলিং টপকে এসে পড়ল সাগরের পানিতে। ডুব সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চলল পানির তলা দিয়ে। বেশ কিছুদূর গিয়ে পানির ওপর মাথা তুলতেই শুনল পাইকারী গোলাগুলির আওয়াজ। ওর আশে পাশেও এসে পড়ল কয়েকটা বুলেট। আবার ডুব দিল সে। এভাবেই ডুব দিয়ে দিয়ে পৌঁছে গেল নৌকোর কাছে। পেনক্র্যাফট তখন উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

রাত দুপুরে গ্র্যানাইট হাউসে পৌঁছল দুই দুঃসাহসী অভিযাত্রী।

সব শুনে হার্বার্ট বলল, 'সেরেছে! এবার নির্ঘাত মারা পড়ব। পঞ্চাশজনের বিরুদ্ধে আমরা মাত্র ছ'জন!'

'সাতচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে।' ভুল সংশোধন করে দিল আয়ারটন, 'তিনজনকে খতম করে এসেছি আমি।'

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে কাটল রাতটা। ভোর হতে কুয়াশার ভেতর দিয়ে আবছা দেখা গেল স্পীডিকে। কুয়াশা না কাটা পর্যন্ত আক্রমণ করবে না জলদস্যুরা। এর আগেই যা করার করতে হবে। গায়ের জোরে ওদের সাথে পারা যাবে না। কাজেই কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। জলদস্যুদের বিশ্বাস করাতে হবে, সংখ্যায় ওদের চেয়ে দ্বীপবাসীরা অনেক বেশি।

চার দলে ভাগ হয়ে গেল ছ'জনে। হার্বার্ট আর হার্ডিং চিমনিতে, মার্সি নদীর মুখে থাকল নেব আর স্পিলেট। উপদ্বীপের দু'জায়গায় লুকিয়ে রইল পেনক্র্যাফট আর আয়ারটন। প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক।

ছটার পর ফিকে হতে শুরু করল কুয়াশা। টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন, স্পীডির চারটে কামানের মুখ দ্বীপের দিকে ফেরানো। ডেকের ওপর ছুটাছুটি করছে পঁচিশ তিরিশ জন দস্যু। চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে লিঙ্কন দ্বীপকে পর্যবেক্ষণ করছে আরও দু'জন। আরও কিছু পরে একটা নৌকো নামানো হলো জাহাজ থেকে। নৌকোটা সাগরে নামতেই বন্দুক হাতে সাতজন দস্যু তাতে উঠে বসল। চারজন পাটাতনের ওপর বন্দুক রেখে দাঁড় বাইতে লাগল। সীসা বাঁধা দড়ি দিয়ে পানির গভীরতা মাপছে একজন। বাকি দু'জন বন্দুক হাতে যে কোন আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে বসে থাকল। উপদ্বীপের দিকেই এগোচ্ছে নৌকোটা।

নৌকোটা তীরে পৌঁছতেই উঠে দাঁড়াল একজন বন্দুকধারী। তীরে নামতে যাবে এমন সময় গুলি করল পেনক্র্যাফট আর আয়ারটন। দাঁড়ানো আর পানি মাপা, দু'জন দস্যুই একসাথে লুটিয়ে পড়ল নৌকোর পাটাতনে।

পরমুহূর্তে কামান দাগার আওয়াজ হলো। আয়ারটন আর পেনক্র্যাফটের মাথার ওপরের পাহাড়-চূড়া উড়ে গেল গোলার আঘাতে। বন্দুকের ধোঁয়া লক্ষ্য করে কামান দাগছে বব হার্ডি।

নৌকোর মুখ জাহাজের দিকে ঘুরিয়ে দ্রুত দাঁড় বেয়ে চলল বাকি পাঁচজন জলদস্যু। আবার গুলি করল পেনক্র্যাফট-আয়ারটন। আরও দু'জন দস্যু মারা গেল। কার্তুজের খোসা দুটো ফেলে বন্দুকে গুলি ভরতে লাগল পেনক্র্যাফট আর আয়ারটন। ততক্ষণে বন্দুকের আওতার বাইরে চলে গেছে বাকি তিনজন জলদস্যু। আবার গর্জে উঠল কামান। আরও কিছু পাথর ভেঙে গড়িয়ে পড়ল পেনক্র্যাফট আর আয়ারটনের আশেপাশে।

স্পীডির গায়ে নৌকোটা ঠেকতেই আরও ডজনখানেক দস্যু লাফিয়ে নামল ওতে। আটজন দস্যু নিয়ে আরও একটা নৌকো ভাসানো হলো পানিতে। একটা নৌকো উপদ্বীপের দিকে অন্যটা মার্সি নদীর মুখ লক্ষ্য করে এগিয়ে এল। এবার জায়গা ত্যাগ করতে হবে পেনক্র্যাফট-আয়ারটনের, নাহলে বিপদে পড়বে। কিন্তু আরও অন্তত দুটোকে ঘায়েল না করে জায়গা ছেড়ে নড়ার ইচ্ছে নেই ওদের।

বন্দুকের আওতায় আসতেই আরও দুটো দস্যুকে গুলি করে মারল পেনক্র্যাফট-আয়ারটন। তারপর একলাফে আড়াল থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে দৌড় দিল খালের দিকে। বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো ওদের আশে পাশে। কিন্তু লাগল না ওদের গায়ে। নিরাপদেই খাল পেরিয়ে চিমনিতে ঢুকে গেল ওরা।

মার্সি নদীর মুখের দিকে আসা আটজনের নৌকোটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলেন এবার স্পিলেট আর নেব। হালধারী আর একজন মাল্লা মারা গেল। সাঁই করে ঘুরে গেল অনিয়ন্ত্রিত নৌকোর মুখ। কিন্তু এতেও রেহাই পেল না, একটা চোরা পাথরে ধাক্কা লেগে উল্টে গেল নৌকো। কোনমতে আছড়ে পাছড়ে তীরে উঠল বাকি ছ'জন। উঠেই ছুট লাগাল ফ্লোটসাম পয়েন্টের দিকে। এক ছুটে একেবারে বন্দুকের নাগালের বাইরে।

'নৌকো নিয়ে আর আসবে না ওরা,' ব্যাপার দেখে বললেন ক্যাপ্টেন। 'জাহাজ নিয়েই খাঁড়ির ভেতরে ঢুকবে। আসল বিপদ দেখা দেবে তখন।'

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হওয়া মাত্র চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট, 'ঠিকই বলেছেন, ক্যাপ্টেন। ওই যে নোঙর তুলছে হারামজাদারা। গ্র্যানাইট হাউসে চলে যাওয়া উচিত আমাদের।'

পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নেব আর স্পিলেট। জাহাজ থেকে দেখা যাবে না ওদের। ওরা দু'জনও গিয়ে চিমনিতে ঢোকার পর উঠে দাঁড়াল আর সবাই। পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে পৌঁছে গেল গ্র্যানাইট হাউসে।

জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ টের পেল অভিযাত্রীরা, কত বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। খাঁড়িতে ঢুকেই সোজা চিমনির ওপর কামান দাগতে শুরু করল জলদস্যুরা। গোলার আঘাতে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে চিমনিটা। হঠাৎ চিমনিতে গোলাবর্ষণ বন্ধ করে দিল ওরা। বোধহয় বুঝতে পেরেছে ওরা কেউ নেই ওখানে। টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে গ্র্যানাইট হাউসের দিকেই তাকিয়ে আছে একজন।

হঠাৎ আবার গর্জে উঠল কামান। গ্র্যানাইট হাউসের জানালার কাছে এসে পড়ল গোলাটা।

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট, 'আমরা কোথায় আছি টের পেয়ে গেছে হারামজাদারা।'

আসলেও তাই। লতাপাতা দিয়ে গ্র্যানাইট হাউসের দরজা জানালা ঢেকে দেয়া হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ভেবেছিলেন জানালা দরজা দেখা না গেলে কিছু বুঝতে পারবে না ডাকাতেরা। কিন্তু সন্দেহ করে বসল ধুরন্ধর বব হার্ডি। পাথরের গায়ে সবুজ লতাপাতা জন্মাতে পারে না। কাজেই দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে।

পরিষ্কার বুঝল দ্বীপবাসীরা, আর রক্ষা নেই। লিঙ্কন দ্বীপে এসে জলদস্যুর গোলা খেয়েই ওদের পরমায়ু শেষ হতে চলেছে। একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছে সবাই।

হঠাৎ প্রচণ্ড কান ফাটানো আওয়াজে কেঁপে উঠল আকাশ-পাহাড়-বনভূমি। এ তো কামানের শব্দ নয়! প্রায় সাথে সাথেই শোনা গেল বহুকণ্ঠের মিলিত আর্তচিৎকার। ব্যাপার কি? দৌড়ে জানালার কাছে এল অভিযাত্রীরা। কিন্তু যা দেখল, নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না যেন। চৌচির হয়ে ভেঙে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছে বিশাল জাহাজটার তলা আর এক পাশের কাঠ। কাত হয়ে গিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে জাহাজটা। মাত্র দশ সেকেণ্ডের ভেতরই জলদস্যুদের নিয়ে পানির তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল স্পীডি।

আটাশ

চোখের সামনে ভোজবাজীর মত ঘটে গেল ঘটনাটা। গ্র্যানাইট হাউসের জানালার সামনে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অভিযাত্রীরা।

'আশ্চর্য!' ক্যাপ্টেনের কথায় চমকে ফিরে তাকাল সবাই।

'এতে আশ্চর্যের কিছু নেই,' পেনক্র্যাফট বলল, 'জলদস্যুরা ট্রেইনড যোদ্ধা না। উত্তেজনার সময় হয়তো এক আধটা জ্যান্ত বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছে বারুদ ঘরে।'

জোয়ারের পানি সরে যাবার পর আবার দেখা গেল স্পীডিকে। কাত হয়ে পড়ে আছে জাহাজটা। প্রায় বিশ ফুট ব্যাসের বিশাল এক গর্ত হয়ে গেছে জাহাজের তলায়। কিন্তু গর্তটা হয়েছে জাহাজের সামনের দিকে। তাহলে পেনক্র্যাফটের অনুমান তো ধোপে টিকছে না। বারুদঘরটা জাহাজের পেছন দিকে। বারুদ বিস্ফোরিত হলে পেছন দিকে হত গর্তটা।

জাহাজের ডেকে এসে উঠল অভিযাত্রীরা। তৈজষপত্র, যন্ত্রপাতি, সিন্দুক, বাক্স, পিপা যা কিছু অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল সব দড়ি আর কপিকলের সাহায্যে নৌকোয় নামিয়ে ডাঙায় তুলতে লাগল অভিযাত্রীরা। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, একবারে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল বারুদঘর।

দেখে শুনে বোকা বনে গেল পেনক্র্যাফট। কি করে ধ্বংস হলো অতবড় জাহাজটা? রহস্যের কিনারা করতে না পারলেও খুশি হলো সবাই। স্পীডির সমস্ত মালপত্র উদ্ধার করতে তিন দিন লেগে গেল। এত মালপত্র পাওয়া গেল যে সব রাখার পর পা ফেলার জায়গা থাকল না আর গ্র্যানাইট হাউসের স্টোর রুমে। বন্দুক, পিস্তল আর গোলা বারুদের তো কথাই নেই। কামান চারটেও জাহাজ থেকে নামিয়ে আনা হলো। এবার যদি কখনও অন্য জলদস্যুরা আক্রমণ করেও তার সমুচিত জবাব দিতে পারবে অভিযাত্রীরা।

স্পীডির ধ্বংসের আসল কারণ জানা গেল তিরিশে নভেম্বর। জোয়ার আর ভাটার টানে ভেঙেচুরে সাগরে গিয়ে পড়েছে জাহাজটা। ওটার কোন চিহ্নই আর দেখা যাচ্ছে না। সেদিন খাঁড়ির ধার দিয়ে আসছে নেব, হঠাৎ জিনিসটা চোখে পড়ল ওর। ভাটার টানে খাঁড়ির পানি নেমে গেছে। স্পীডি যেখানে ডুবেছিল তার থেকে একটু দূরে একটা লোহার চোঙা পড়ে আছে। কৌতূহল হওয়ায় চোঙাটা তুলে আনল নেব। চিনতে না পেরে ক্যাপ্টেনকে দেখাল সে জিনিসটা। একবার দেখেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, 'হুঁ, এবার বুঝলাম কারণটা।'

'কিসের কারণ, ক্যাপ্টেন?' জিজ্ঞেস করল পেনক্র্যাফট।

'কেন ডুবেছে স্পীডি।' চোঙাটাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওটা একটা টর্পেডোর অংশ।'

'টর্পেডো!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

'হ্যাঁ টর্পেডো। স্পীডির তলায় কেউ আঘাত হেনেছিল ওটা দিয়ে। আর একবার আমাদের সবার প্রাণ বাঁচালেন রহস্যময় সেই অশরীরী শক্তি।'

স্পীডি ধ্বংস হলেও কিন্তু একটা সমস্যা থেকে গেল। নৌকো থেকে নেমে ফ্লোটসাম পয়েন্টের দিকে পালিয়েছিল ছ'জন দস্যু। ওদেরকে খুঁজে বের করতে

হবে। আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো অভিযাত্রীরা, খুঁজে বের করতে হবে রহস্যময় সেই ত্রাণকর্তাকেও তার আগে দিন দুয়েকের জন্যে খোঁয়াড়ে যেতে হবে আয়ারটনকে। জানোয়ারগুলোর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে আসবে। নয়ই নভেম্বর খোঁয়াড়ে চলে গেল আয়ারটন। এর মধ্যে খবরাখবরের দরকার হলে টেলিগ্রাফ তো রয়েছেই।

আয়ারটনের ফেরার কথা সেদিন, হঠাৎ দুপুর বেলা স্পিলেট বললেন, 'বন-অ্যাডভেঞ্চারের অবস্থাটা একবার দেখা উচিত না? যদি জলদস্যুদের চোখে পড়ে যায়?'

কথাটার গুরুত্ব আছে। সাথে সাথেই বন্দুক হাতে রওনা হয়ে গেলেন স্পিলেট, পেনক্র্যাফট আর নেব। পোর্ট বেলুনে পৌঁছে দেখা গেল আগের মতই পানিতে ভাসছে বন-অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু নোঙর বাঁধা দড়িটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠে বলল পেনক্র্যাফট, 'অবাক কাণ্ড!'

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলেন স্পিলেট।

'নতুন গিঁট দিয়েছে কেউ দড়িতে!'

'গিঁট আবার দিতে যাবে কে? তুমিই দিয়েছ, খেয়াল নেই হয়তো।'

'অসম্ভব। এ ধরনের গিঁট ভুলেও দিই না আমি। সোজা কথা, বন-অ্যাডভেঞ্চারকে নিয়ে বেরিয়েছিল কেউ। ফিরে এসে আবার আগের জায়গায় বেঁধে রেখেছে।'

ফিরে গিয়ে কথাটা জানাতে ক্যাপ্টেন বললেন, 'গ্র্যানাইট হাউসের কাছাকাছিই আরেকটা বন্দর তৈরি করতে হচ্ছে। না হলে কোনদিন হয়তো খোয়াই যাবে নৌকোটা।'

সময় হয়ে যাবার পরও আসছে না দেখে খোঁয়াড়ে টেলিগ্রাফ করা হলো আয়ারটনকে। দুটো ছাগল সাথে করে আনার নির্দেশও দেয়া হলো ওকে। কিন্তু ওদিক থেকে জবাব এল না। আশ্চর্য তো!

রাতেও যখন ফিরল না আয়ারটন, ভোরে উঠে টেলিগ্রাফের পর টেলিগ্রাফ করা হলো। কিন্তু সাড়া নেই ওপাশ থেকে। তবে কি কোন বিপদে পড়েছে আয়ারটন, নাকি বিগড়ে গেছে টেলিগ্রাফ?

আর তো দেরি করা যায় না। গ্র্যানাইট হাউসে শুধু নেবকে রেখে বন্দুক হাতে খোঁয়াড়ের দিকে রওনা হলো সবাই। টেলিগ্রাফের লাইন ধরে ধরে এগোল ওরা। কারণটা জানা গেল তখনই। মাইল দুয়েক দূরের চুয়াত্তর নম্বর খুঁটিটা উপড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে কেউ। ছিঁড়ে গেছে ওখানকার টেলিগ্রাফের তার। তার যারা ছিঁড়েছে, আয়ারটনকে জখম করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। খোঁয়াড়ের দিকে ছুটল সবাই।

খোঁয়াড়ের কাছে পৌঁছে দেখল ওরা, গেটটা অক্ষতই আছে। বেড়াও ভাঙেনি কোথাও। কিন্তু খটকা লাগল ক্যাপ্টেনের মনে। এত চুপচাপ কেন খোঁয়াড়টা! জন্তু-জানোয়ার বা মানুষ কারোই কোন সাড়াশব্দ নেই।

সতর্ক করলেন তিনি আর সবাইকে। বন্দুক বাগিয়ে ধরে পা টিপে টিপে গেটের দিকে এগোল ওরা। আস্তে করে গেটের হুড়কো খুলে ভেতরে পা দিলেন ক্যাপ্টেন। ঠিক সেই সময় বন্দুকের আওয়াজের পরপরই শোনা গেল হার্বার্টের আর্তচিৎকার।

'কি হলো, হার্বার্ট, কি হলো?' হাত থেকে বন্দুকটা ফেলে দিয়ে হার্বার্টের দিকে ছুটে গেল পেনক্র্যাফট। উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে হার্বার্ট। স্পিলেট আর

হার্ডিংও ওর দিকে ছুটে গেলেন। কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসে হার্বার্টের নাড়ি দেখলেন স্পিলেট। বললেন, 'এখনও বেঁচে আছে হার্বার্ট।'

'জলদি খোঁয়াড়ে নিয়ে চলো ওকে,' তাড়া লাগালেন ক্যাপ্টেন।

পেনক্র্যাফট আর স্পিলেট ধরাধরি করে মাটি থেকে তুলে নিল হার্বার্টকে। আগে আগে চললেন ক্যাপ্টেন। গেটের ভেতর ঢুকতেই আবার গর্জে উঠল বন্দুক। গুলির আঘাতে ক্যাপ্টেনের মাথা থেকে হ্যাটটা উড়ে গেল। চমকে উঠে বাঁ পাশে চাইলেন ক্যাপ্টেন। মাত্র ছয় ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন জলদস্যু। ক্যাপ্টেনের মাথা সই করেই গুলি করেছিল সে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে চলে যায় গুলিটা। বন্দুকে আবার গুলি ভরতে শুরু করেছে দস্যুটা, কিন্তু ওকে আর সুযোগ দিলেন না ক্যাপ্টেন। কোমর থেকে ছোরাটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন দস্যুর বুক লক্ষ্য করে। নির্ভুল নিশানা, ছুরিটা আমূল বিঁধে গেল দস্যুর বুকে। আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

শূন্য খোঁয়াড়ের ভেতরে আয়ারটনের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো হার্বার্টকে। এখন ডাক্তার পাওয়া যাবে কোথায়? অভিযাত্রীদের কেউই তো ডাক্তারী জানেন না। তবে ফার্স্ট এইড দিতে পারেন ক্যাপ্টেন আর স্পিলেট দু'জনেই।

জ্ঞান নেই হার্বার্টের। ক্ষীণ নাড়ির গতি, ফ্যাকাসে মুখ। অবস্থা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। আস্তে আস্তে হার্বার্টের গায়ের জামাটা খুলে নিল পেনক্র্যাফট। ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। পাঁজরার তৃতীয় আর চতুর্থ হাড়ের মাঝখান দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলিটা। আর একটু হলেই হৃৎপিণ্ডে লাগত। পরিষ্কার পানি দিয়ে ক্ষতস্থানটা ভাল করে ধুয়ে নিয়ে শার্ট ছিঁড়ে ভাল করে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন ক্যাপ্টেন। কয়েকঘণ্টা পরই জ্বর আসবে, তার আগেই জ্বরনাশক গাছের ছাল দিয়ে রস তৈরি হলো। হার্বার্টের ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ধরলেন স্পিলেট। চামচে করে সেই রস একটু একটু করে হার্বার্টের মুখে ঢেলে দিল পেনক্র্যাফট। তা সত্ত্বেও জ্বর এল, প্রচণ্ড জ্বর। সে দিনটা গেল, রাত গেল কিন্তু জ্ঞান ফিরল না হার্বার্টের। পরদিন এবং রাতটাও অজ্ঞান হয়ে থাকল সে। চিন্তিত ভাবে এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলেন স্পিলেট আর ক্যাপ্টেন।

এর পরদিন। বারোই নভেম্বর সকালে চোখ মেলল হার্বার্ট। জ্বরও কম একটু। একনাগাড়ে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছে পেনক্র্যাফট। কাজেই পচতে পারল না জায়গাটা। তবে ক্ষতের মুখ দিয়ে পুঁজ বেরোতে শুরু করেছে। একটু পরই আবার চোখ বন্ধ করল হার্বার্ট। স্বাভাবিক ঘুম।

আয়ারটনের কথা মনে হলো এবার ওদের। খোঁয়াড়ের বাইরে ভেতরে কোথাও ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। গেল কোথায় আয়ারটন?

'যদ্দূর মনে হয় আয়ারটনকে বন্দী করে নিয়ে গেছে দস্যুরা,' বললেন স্পিলেট।

আয়ারটনের ঘর তল্লাশী করে দেখা গেল ওর বন্দুক আর কার্তুজগুলোও অদৃশ্য হয়েছে। খোঁয়াড়ের বাইরেই হয়তো ওত পেতে বসে আছে দস্যুরা। কাউকে বেরোতে দেখলেই গুলি করবে।

আরেকটা সমস্যার কথা মনে পড়ল স্পিলেটের। ক্যাপ্টেনকে বললেন তিনি, 'আমাদের দেরি দেখে যদি খুঁজতে বেরোয় নেব? নির্ঘাত গুলি খেয়ে মারা পড়বে ও।'

'হ্যাঁ।' চিন্তিত ভাবে বললেন ক্যাপ্টেন, 'তারচেয়ে আমিই বরং গ্র্যানাইট হাউসে চলে যাই।'

'পাগল?' বাধা দিলেন স্পিলেট, 'আপনার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না

তাহলে। খোঁয়াড়ের ওপরই নজর রাখছে এখন দস্যুরা।'

গভীর ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। হঠাৎ টপের ওপর তাঁর নজর পড়তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। বললেন, 'পেয়েছি। খবর নিয়ে যাবে টপ। ঘন্টা দেড়েকের ভেতরই ফিরে আসতে পারবে ও।'

সাথে সাথেই কাজে লেগে গেলেন ক্যাপ্টেন। পকেট থেকে কাগজ আর কলম বের করে লিখলেন, 'হার্বার্ট জখম হয়েছে। আমরা খোঁয়াড়ে বন্দী। খবরদার, গ্র্যানাইট হাউসের বাইরে যাবার চেষ্টা কোরো না। আশেপাশে দস্যুদের দেখে থাকলে টপের মাধ্যমে খবর পাঠাও।'

টপের গলায় কাগজটা বেঁধে ওকে গেটের কাছে নিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। আঙুল তুলে গ্র্যানাইট হাউসের দিকে নির্দেশ করে ইঙ্গিত করলেন কুকুরটাকে। মুহূর্তে বুঝে নিল ট্রেনিং পাওয়া প্রখর বুদ্ধিমান কুকুর। এক লাফে গেট পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকল টপ। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে

ঘন্টাখানেক পেরিয়ে যাবার পর হঠাৎ বন্দুক গর্জে উঠল খোঁয়াড়ের বাইরের জঙ্গলে। ছুটে গিয়ে গেটটা একটু ফাঁক করলেন ক্যাপ্টেন। শ'খানেক গজ দূরের গাছের আড়ালে চকিতে সরে গেল একটা মুখ। ঠিক সেই মুহূর্তে তীরের মত ছিটকে এসে ভেতরে ঢুকল টপ। সাথে সাথে গেট বন্ধ করে দিলেন ক্যাপ্টেন।

চিঠি পাঠিয়েছে নেব। টপের গলা থেকে ওটা খুলে নিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। নেব লিখেছে, 'গ্র্যানাইট হাউসের আশেপাশে এখনও দস্যুদের দেখা যায়নি। কোন অবস্থায় বাইরে বেরোব না আমি। হার্বার্টের দুর্ঘটনাটা শুনে আন্তরিক দুঃখিত। আশা করছি শীঘ্রিই সেরে উঠবে ও।'

বাধ্য হয়ে খোঁয়াড়েই থাকতে হলো ওদের। দৃঢ় গলায় ঘোষণা করলেন ক্যাপ্টেন, 'হার্বার্টকে সেরে উঠতে দাও আগে, তারপর দেখা যাবে কিভাবে বাঁচে ওরা।'

আরও কয়েকটা দিন গেল। আস্তে আস্তে ঘা শুকিয়ে গেল হার্বার্টের, জ্বরও কমে গেল। আরও দশদিন পর, বাইশে নভেম্বর, নিজের হাতে খেতে পারল হার্বার্ট। কিন্তু গ্র্যানাইট হাউসে এখনও ওকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কাজেই আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

ঊনত্রিশ

আস্তে আস্তে সেরে উঠতে লাগল হার্বার্ট। আর থাকা যায় না খোঁয়াড়ে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে গ্র্যানাইট হাউসে স্থানান্তরিত করা উচিত। নেবেরও কোন খবর নেই। কি অবস্থায় আছে ও কে জানে!

কিন্তু দস্যুদের ব্যূহ ভেদ করে কিভাবে গ্র্যানাইট হাউসে পৌঁছানো সম্ভব ঠিক করতে পারছে না কেউ। সেদিন খেপে উঠল পেনক্র্যাফট, 'হারামজাদাদের ভয়ে এভাবে লুকিয়ে থাকলে কি করে হবে? আজ বেরোবই আমি।'

'পাঁচজনের বিরুদ্ধে একা কি করবে তুমি?' বাধা দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন।

'একা নয়। টপকে নিয়ে যাব সাথে।'

'পাগল! জেনেশুনে গুলির মুখে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'কিন্তু তাই বলে—।'

'দেখো, এমনিতেই হার্বার্টকে নিয়ে বহু ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। তার ওপর

তোমার যদি কিছু হয় তাহলে সবাই বিপদে পড়ব আমরা।'

কথাটা ঠিক, করার কিছুই নেই। শুধু রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকল পেনক্র্যাফট।

'এ সময় আয়ারটন কাছে থাকলে বেশ ভাল হত।' স্পিলেট কথাটা বলতেই পেনক্র্যাফটের মেজাজ আরও খিচড়ে গেল।

'ভয়ের কিছু নেই, মরেনি আয়ারটন,' বলল পেনক্র্যাফট।

'মানে, আয়ারটনকে মেরে ফেলেনি দস্যুরা?'

'মারবে কি? মরতে চাইলেও তো বাঁচিয়ে রাখবে।'

হঠাৎ পেনক্র্যাফটের কথার মানে বুঝতে পারলেন স্পিলেট, 'আয়ারটন বেঈমানি করেছে বলতে চাও? ভাবছ পুরানো দোস্তদের সাথে যোগ দিয়েছে আবার?'

'করতেও পারে।'

'এতটা নীচ ভেবো না ওকে, পেনক্র্যাফট!' বললেন ক্যাপ্টেন, 'আর যাই করুক, অন্তত বেঈমানি করবে না আয়ারটন।'

'মাফ করবেন, ক্যাপ্টেন। এই জেলখানায় বন্দী থাকতে থাকতে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে আমার।'

'আর ক'টা দিন, পেনক্র্যাফট। হার্বার্টকে আর একটু সুস্থ হয়ে উঠতে দাও এখন ওকে বেশি নাড়াচাড়া করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।'

সাতাশে নভেম্বর। সেদিন আর থাকতে না পেরে বন্দুক হাতে টপসহ খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে পড়লেন স্পিলেট। আস্তে করে খোঁয়াড়ের গেট খুলে বেরিয়ে এলেন তিনি। কিন্তু বেরিয়ে আসার পরও গুলি করল না কেউ। সাহস বেড়ে গেল ওঁর। একছুটে ঢুকে গেলেন সামনের জঙ্গলে। গাছপালার আড়ালে আড়ালে মাইল দেড়েক এগোনোর পরই কিসের যেন গন্ধ পেয়ে ডেকে উঠল টপ। সামনে পেছনে ছুটাছুটি করে কোথাও যেন সে নিয়ে যেতে চাইছে স্পিলেটকে। বুঝতে পেরে টপের পিছন পিছন চললেন স্পিলেট। মিনিট পাঁচেক এগোবার পরই একটা ঝোপে ঢুকে একটুকরো রক্তমাখা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে বেরিয়ে এল টপ। টুকরোটা পরীক্ষা করে বুঝলেন ওটা আয়ারটনের ওয়েস্টকোটের অংশ। ওটা নিয়ে খোঁয়াড়ে ফিরে এলেন তিনি।

'পেনক্র্যাফট, কি বুঝলে?' কাপড়ের টুকরোটা দেখে বললেন ক্যাপ্টেন, 'টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আয়ারটনকে। আর সন্দেহ আছে তোমার?'

'কথাটা বলার জন্যে আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'কি?'

'বেঁচে আছে এখনও আয়ারটন।'

'হতে পারে,' চিন্তিতভাবে বললেন ক্যাপ্টেন।

গ্র্যানাইট হাউসে ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে হার্বার্ট। ওর জন্যে সবাই আটকা পড়ে আছে খোঁয়াড়ে, কথাটা ভেবে সারাক্ষণ অস্বস্তিতে ভুগছে ও। আরও দু'দিন পেরিয়ে গেল।

সেদিন উনত্রিশে নভেম্বর। সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করল টপ। কেউ আসছে নিশ্চয়ই খোঁয়াড়ের দিকে। বন্দুক নিয়ে গেটের দিকে ছুটলেন স্পিলেট, পেনক্র্যাফট আর ক্যাপ্টেন। কিন্তু গেটের কাছে পৌঁছার আগেই ওপাশের বেড়া টপকে খোঁয়াড়ের ভেতর লাফ দিয়ে নামল একটা ছায়ামূর্তি। আবার চেঁচিয়ে উঠল টপ। টপের খুশি খুশি ডাকের সাড়া দিল মাস্টার জাপ।

ক্যাপ্টেনের সামনে এসে দাঁড়াল জাপ। গলায় একটা থলি বাঁধা। একটা ছোট্ট কাগজ বেরোল থলিটা থেকে। নেবের চিঠি।

'শুক্রবার, ভোর ছটা। দস্যুরা গ্র্যানাইট হাউস আক্রমণ করার ফন্দি আঁটছে। নেব।'

নেবের চিঠি পড়ে দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়ল সবাই। এখন কি করা যায়? হার্বার্ট অসুস্থ। ওদিকে গ্র্যানাইট হাউস আক্রমণ করতে যাচ্ছে দস্যুরা।

'ক্যাপ্টেন, আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না।' জেদ ধরল হার্বার্ট, 'আজই গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে যাব আমরা। আমার জন্য সবার সর্বনাশ হয়ে যাবে এ আমি ভাবতেও পারছি না।'

অগত্যা রাজি হলেন ক্যাপ্টেন। পরদিন খুব ভোরে ওনাগা দুটোকে গাড়িতে জোড়া হলো। হার্বার্টকে গাড়িতে শুইয়ে দিয়ে, বন্দুক হাতে দু'পাশে বসে পাহারায় থাকলেন ক্যাপ্টেন আর স্পিলেট। লাগাম ধরে খুব সাবধানে খানা খন্দ বাঁচিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল পেনক্র্যাফট। গাড়িতে বেশি ঝাঁকুনি লাগলে কষ্ট হবে হার্বার্টের।

চলতে চলতে একসময় গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল নীল সাগর। প্রসপেক্ট হাইটের কাছে পৌঁছে গেছে গাড়ি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট, 'হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চারা সব শেষ করে ফেলেছে!'

'কি হলো, পেনক্র্যাফট?' উৎকণ্ঠিত ভাবে গাড়ি থেকে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন। উত্তরে আঙুল দিয়ে পোলট্রির দিকে দেখিয়ে দিল পেনক্র্যাফট।

উইণ্ডমিল আর পোলট্রি হাউস থেকে একটানা কালো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে। ধোঁয়ার ভেতর ছুটোছুটি করছে হতভম্ব নেব। গাড়িটা দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়াল সে। তারপর ছুটে এল গাড়ির কাছে।

'কুত্তার বাচ্চাগুলো কোথায়, নেব?' জিজ্ঞেস করল পেনক্র্যাফট।

'চলে গেছে। কিন্তু শেষ করে দিয়ে গেছে সব। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করেছে উইণ্ডমিল আর পোলট্রি। পায়ে মাড়িয়ে দুমড়ে দিয়েছে খেতের ফসল।' একটু থেমে উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করল নেব, 'তা হার্বার্টের কথা বলছ না কেন? ভাল আছে তো ও?'

'আছে।'

ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে ধ্বংসপ্রাপ্ত পোলট্রির দিকে তাকিয়ে আছেন স্পিলেট আর ক্যাপ্টেন ওদেরকে সালাম জানিয়ে গাড়ির ভেতর উঁকি দিল নেব। ডাকল, 'হার্বার্ট, শুনছ? হার্বার্ট?'

উত্তর দিল না হার্বার্ট। বেশ কয়েকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে স্পিলেটকে ডাকল নেব, 'মি. স্পিলেট, কথা বলছে না কেন হার্বার্ট?'

'অ্যাঁ!' দৌড়ে এলেন স্পিলেট। গাড়ির ভেতর ঢুকে দেখলেন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে হার্বার্ট। একটু পরীক্ষা করেই বুঝলেন জ্ঞান হারিয়েছে সে।

গ্র্যানাইট হাউসে তোলা হলো হার্বার্টকে। ওর অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যেতে লাগল। প্রচণ্ড জ্বরে প্রলাপ বকতে শুরু করল সে।

'জ্বরের ওষুধ দরকার,' বললেন স্পিলেট।

'কিন্তু কোথায় পাব ওষুধ?' বিষণ্ন ভাবে বললেন ক্যাপ্টেন, 'পেরুভিয়ান গাছও নেই। কুইনিনও নেই।'

'কেন, উইলো গাছ তো আছে। ওর ছাল ছেঁচে রস খাওয়ালে কাজ হবে না

কিছুটা?'

'দেখি।'

নিজে গিয়ে উইলোর ছাল কেটে আনলেন ক্যাপ্টেন। সন্ধ্যার দিকে ওষুধ বানিয়ে খাওয়ানো হলো হার্বার্টকে। কিন্তু কিছুই হলো না। পড়ে থেকে থেকে আগেই দোষ হয়ে গিয়েছিল লিভারে, এবার আক্রান্ত হয়েছে মগজ। বেশ ভাবনায় পড়লেন স্পিলেট। জ্বরের ধরন দেখে কিছুটা আঁচ করতে পারছেন তিনি। ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার। যদ্দুর মনে হচ্ছে এটা ম্যালিগন্যান্ট ফিভার। জ্বর না কমলে বাঁচানো যাবে না হার্বার্টকে।'

'ম্যালিগন্যান্ট ফিভার!' ভয় পেয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ। জলা থেকে জ্বরের জীবাণু নিয়ে এসেছে ও। প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু দ্বিতীয় ধাক্কায় ঠিকমত ওষুধ দিতে না পারলে তৃতীয়বারে ঠিক মারা যাবে ও।'

'উইলোর ছালের রস তো খাওয়ানো হলো। দেখা যাক কি হয়।'

'কিছু হবে না। কুইনিন দরকার। এ জ্বরের একমাত্র প্রতিষেধক কুইনিন।'

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে কুইনিন? শেষ পর্যন্ত সাধারণ একটা ওষুধের জন্যে মারা যাবে হার্বার্ট? খবরটা পেনক্র্যাফট আর নেবের কাছ থেকে গোপন রাখা হলো।

রাতে আরও বাড়ল জ্বর। মরার মত বিছানায় পড়ে রইল হার্বার্ট। পরদিন নয়ই ডিসেম্বর অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নিল। বার বার জ্ঞান হারাতে লাগল হার্বার্ট। সত্যিই কি তাহলে মারা যাচ্ছে সে? এভাবেই দিনটা কেটে গেল। রাত তিনটায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হার্বার্ট। হাত-পা খিঁচতে শুরু করেছে। পাশে বসে ছিল নেব। ছুটে গিয়ে পাশের ঘরে আর সবাইকে খবর দিল সে।

ঠিক সেই সময় ডেকে উঠল টপ। অদ্ভুত কিছু যেন দেখতে পেয়েছে সে। কিন্তু তা উপেক্ষা করে সবাই ছুটে গেল হার্বার্টের ঘরে। হার্বার্টের নাড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। সাঙ্ঘাতিক রকম বেড়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। বড়জোর আর একটা দিন বাঁচবে হার্বার্ট। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে পেনক্র্যাফট।

রাতটা ভোর হলো এক সময়। জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়ল সকালের সোনালি রোদ। তখনই হঠাৎ জিনিসটা চোখে পড়ল পেনক্র্যাফটের। আঙুল তুলে সবাইকে দেখাল সে, 'ওটা এল কোত্থেকে? কি ওটা?'

ঘুরে চাইল সবাই। টেবিলের উপরে রোদ পড়েছে। রোদে ঝক ঝক করছে টেবিলে রাখা অয়েল পেপারে মোড়ানো প্যাকেটটা। উঠে গিয়ে প্যাকেটটা তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন। প্যাকেটটার গায়ে পরিষ্কার ইংরেজি অক্ষরে লেখা—সালফেট অব কুইনিন।

দ্রুত প্যাকেটটা খুলে ফেললেন ক্যাপ্টেন। ভেতরে প্রায় দু'শ গ্রেন সাদা গুঁড়ো। আঙুলের ডগায় কয়েকটা গুঁড়ো তুলে জিভে ছোঁয়ালেন তিনি। পরক্ষণেই থু থু করে ফেলে দিলেন। দারুণ তেতো কুইনিন।

বিন্দুমাত্র দেরি না করে কফি বানিয়ে আনল নেব। তাতে আঠারো গ্রেনের মত কুইনিন মিশিয়ে একটু একটু করে খাওয়ানো হলো হার্বার্টকে। ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই অনেকটা শান্ত হয়ে এল হার্বার্ট।

অদ্ভুত এই ব্যাপার নিয়ে জোর আলোচনা শুরু করল অভিযাত্রীরা। ওদের চরম বিপদের মুহূর্তে আবার উদয় হলেন রহস্যময় ত্রাণকর্তা। কিন্তু এই দুর্ভেদ্য গ্র্যানাইটের দুর্গে কি করে এলেন? সত্যিই কি তাহলে অশরীরী তিনি?

তিন ঘন্টা পর পর হার্বার্টকে কুইনিন খাওয়াতে থাকলেন স্পিলেট।

কেটে গেল আরও দশ দিন। জ্বর ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু হার্বার্টের শরীর অত্যন্ত

দুর্বল। হার্বার্ট বেঁচে গেছে দেখে খুশিতে লাফাচ্ছে পেনক্র্যাফট। স্পিলেটের নামের আগে নতুন খেতাব জুড়ে দিয়েছে সে, 'ডাক্তার স্পিলেট।'

জানুয়ারির শেষ দিকে একেবারে সেরে উঠল হার্বার্ট। সাগরের তাজা হাওয়া আর নেবের রাশ নুরগীর স্যুপ খেয়ে খেয়ে তাজা হয়ে উঠল শরীর।

হার্বার্ট ভাল হয়ে ওঠার পর দুটো প্রতিজ্ঞা করল অভিযাত্রীরা : এক, পাঁচ দস্যুকে খতম করা, আর দুই, রহস্যময় ত্রাণকর্তার গোপন আবাসস্থল খুঁজে বের করা। এই দুটো কাজ শেষ না করে আর গ্র্যানাইট হাউসে ফিরবে না বলে ঠিক করল তারা।

তৈরি হয়ে দল বেঁধে গ্র্যানাইট হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা। জাপ আর টপও রইল সঙ্গে। ওদের অনুপস্থিতির সুযোগে যেন কেউ গ্র্যানাইট হাউসে উঠতে না পারে সে ব্যবস্থা পাকা করেই বেরিয়েছে ওরা। সেদিন চোদ্দই ফেব্রুয়ারি।

পাহাড় জঙ্গলে ঘোরার মত শক্তি হার্বার্টের শরীরে এখনও হয়নি। কাজেই ওনাগায় টানা গাড়িতে চেপে বসল সে। কাঠের সেতু পেরিয়ে আস্তে আস্তে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করল অভিযাত্রীরা। বুনো জানোয়ারগুলোর সন্ত্রস্ত ভাব দেখে বললেন ক্যাপ্টেন, 'আমাদের দেখে সাঙ্ঘাতিক রকম চমকে উঠেছে জানোয়ারগুলো। মানে এ পথেই গেছে ডাকাতেরা, যাবার সময় ভয় পাইয়ে দিয়ে গেছে জানোয়ারগুলোকে।'

সামনে ডাকাতদের যাত্রাপথের আরও নমুনা পাওয়া গেল—জুতোর ছাপ, গাছের ভাঙা ডাল, আগুন জ্বালানোর চিহ্ন।

সেদিন রাতটা ঝর্নার ধারে কাটাল অভিযাত্রীরা। পরদিন রওনা হয়ে পথে আবার পাওয়া গেল ডাকাতদের জুতোর ছাপ। বিভিন্ন আকারের জুতোর ছাপ গুনে নিশ্চিত হলেন ক্যাপ্টেন—পাঁচজোড়া পায়ের ছাপ। অর্থাৎ আয়ারটন নেই ওদের সাথে। খুব সম্ভব ওরা খুন করেছে আয়ারটনকে।

চলতে চলতে পরদিন দ্বীপের শেষ প্রান্তে এসে হাজির হলো অভিযাত্রীরা। কিন্তু ডাকাতদের বা ত্রাণকর্তার গোপন আবাসস্থলের চিহ্ন পাওয়া গেল না কোথাও।

ত্রিশ

'মনে হয় ফ্র্যাঙ্কলিন হিলের কোন গুহায় লুকিয়ে আছে হারামখোরেরা,' বললেন স্পিলেট।

এবার খোঁয়াড়ের দিকে এগিয়ে চলল অভিযাত্রীরা। খোঁয়াড়কে ঘাঁটি বানিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন হিলে অনুসন্ধান চালানোর ইচ্ছে ক্যাপ্টেনের। কে জানে খোঁয়াড়েই আড্ডা গেড়েছে কিনা ডাকাতেরা। তাহলে জোর করে খোঁয়াড় দখল করতে হবে। কিন্তু যাওয়ার আগে জেনে নেয়া দরকার ব্যাটারা সত্যিই ওখানে আছে কিনা। থাকলে দিনের বেলা হামলা করা আত্মহত্যারই সামিল হবে।

দিনের বেলা তাই খোঁয়াড়ের কাছের জঙ্গলে আত্মগোপন করে রইল অভিযাত্রীরা। দিন গড়িয়ে সাঁঝ হলো। হঠাৎ করেই অন্ধকার নামল জঙ্গলের বুকে। আটটা বাজতেই পেনক্র্যাফটকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন স্পিলেট। বাকি সবাই আগের জায়গায়ই অপেক্ষা করে রইল।

নিঃশব্দে বন পেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল দু'জনে। প্রায় ত্রিশ ফুট ফাঁকা মাঠের পর খোঁয়াড়ের গেট। এ জায়গাটুকু পেরোনোই সবচেয়ে বিপজ্জনক

মাটিতে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে গেটের দিকে এগোল দু'জন। গেটের কাছে পৌঁছে আস্তে করে ঠেলা দিলেন স্পিলেট খুলল না গেট। ভেতর থেকে বন্ধ। অর্থাৎ খোঁয়াড়েই আড্ডা গেড়েছে ডাকাতরা।

যেমন গিয়েছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরে এল দু'জনে। কথাটা শুনলেন ক্যাপ্টেন। সবাই চলল এবার খোঁয়াড়ের দিকে। পুরু ঘাসের উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ওরা। নির্বিঘ্নে গেট পর্যন্ত পৌঁছে গেল অভিযাত্রীরা। পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। হাঁ হয়ে খুলে আছে গেটের পাল্লা।

'অবাক কাণ্ড!' ফিস ফিস করে বললেন স্পিলেট।

'অবাক হবার কিছু নেই। কেউ হয়তো কোন কাজে বাইরে বেরিয়েছে।' ফিস ফিস করেই বললেন ক্যাপ্টেন।

পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে পড়ল হার্বার্ট মিনিট খানেক পরই ফিরে এল আবার। ক্যাপ্টেনকে বলল, 'আলো জ্বলছে ভেতরে।'

জাপ আর টপকে গাড়ির কাছে রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল সবাই। ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে আলোর রেখা।

'ভেতরেই আছে বদমাশগুলো। শুয়োরগুলোকে খতম করার এই সুযোগ।' বলল পেনক্র্যাফট।

দু'ভাগ হয়ে গেল অভিযাত্রীরা বেড়ার ধার ঘেঁষে এগিয়ে চললেন ক্যাপ্টেন, নেব আর হার্বার্ট। উঠানের ওপর দিয়ে কোণাকোণি এগোলেন স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট।

নিঃশব্দে ঘরের কাছে পৌঁছে গেলেন ক্যাপ্টেন। উঁকি মেরে দেখলেন টেবিলের ওপর রাখা আছে বাতিটা। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে একজন লোক।

লোকটাকে দেখেই অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন ক্যাপ্টেন। আয়ারটন। বিছানায় শোয়া লোকটা আয়ারটন।

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে পড়ল পাঁচজনেই। সাঙ্ঘাতিক নির্যাতনের চিহ্ন আয়ারটনের কব্জিতে, পায়ের গাঁটে। ঘা হয়ে গেছে জায়গাগুলোতে। অভিযাত্রীদের পায়ের শব্দে চোখ মেলে চাইল আয়ারটন, বিড় বিড় করে বলল, 'আপনারা, আপনারা এসেছেন?'

'হ্যাঁ, আয়ারটন।'

'আমি কোথায়?'

'কেন, খোঁয়াড়ে।'

'দস্যুরা কোথায়?'

'আশপাশে তো দেখছি না।'

'এখুনি এসে পড়বে। তৈরি হয়ে যান।' বলেই অজ্ঞান হয়ে গেল আয়ারটন।

গাড়িটাকে খোঁয়াড়ের ভেতর নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। গাড়িটা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে খোঁয়াড়ের গেট বন্ধ করে দেয়া হলো। হুঁশিয়ার থাকতে হবে এখন। কোথায় লুকিয়ে আছে ডাকাতেরা, কে জানে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল টপ। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে ছুটল খোঁয়াড়ের পেছন দিকে। জাপও দৌড়ুল সেদিকে। পেছন পেছন বন্দুক বাগিয়ে ছুটল অভিযাত্রীরা।

আকাশে চাঁদ ওঠায় অন্ধকার কেটে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের ঘোলাটে চাঁদের আলোয় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে খোঁয়াড়ের পেছনে ঝর্নাটা। ঝর্নার পাড়ে শুয়ে আছে পাঁচজন লোক। কাঁধে বন্দুক তুলে নিয়ে আর একটু এগিয়ে গেল অভিযাত্রীরা। কিন্তু বিন্দুমাত্র নড়ল না লোকগুলো। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন ক্যাপ্টেন। সবাইকে বন্দুক নামাবার নির্দেশ দিলেন তিনি।

আসলে ঝর্নার পাশে পড়ে আছে পাঁচটা লাশ।

অবাক কাণ্ড! কি করে মারা গেল পাঁচজন দুর্ধর্ষ ডাকাত? যেভাবেই মারা যাক দিনের বেলায় বোঝা যাবে। রাতের মত ঘুমাতে গেল সবাই। তার আগে স্পিলেট একবার আয়ারটনের নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলেন। ঠিকই আছে। আসলে অত্যাচারে অতিমাত্রায় কাহিল হয়ে পড়েছে আয়ারটন।

পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরলে নিজের দুর্ভোগের কাহিনী সবাইকে শোনাল আয়ারটন। খোঁয়াড়ে আসার পরদিনই আয়ারটনকে বন্দী করে ফ্র্যাঙ্কলিন হিলের এক গুহায় নিয়ে যায় ডাকাতেরা। ওর কাছ থেকে কথা আদায়ের পর মেরে ফেলাই ওদের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা ডাকাত ওকে 'বেন জয়েস' বলে চিনতে পারে। তারপরই ডাকাতরা ওকে দলে টানার চেষ্টা করে। ওদের ইচ্ছে ছিল আয়ারটনের সাহায্যে অভিযাত্রীদের হত্যা করে দ্বীপটার মালিক হয়ে বসবে। কিন্তু রাজি হয়নি আয়ারটন। শুরু হলো ওর ওপর অকথ্য নির্যাতন। দীর্ঘ চারমাস ধরে নির্যাতন চালাবার পর ওকে পাহাড়ের গুহায় ফেলে রেখে চলে আসে ডাকাতেরা। তারপর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে এক সময় জ্ঞান হারায় আয়ারটন। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর। খোঁয়াড়ে সে কি করে এল বলতে পারবে না। সংক্ষেপে এই হলো আয়ারটনের কাহিনী।

'কিন্তু পাঁচটা দস্যুই যে মরে আছে ঝর্নার ধারে। কি করে মরল ওরা?' প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

'মরে পড়ে আছে।' উত্তেজনায় উঠে বসার চেষ্টা করল আয়ারটন। ধরাধরি করে বাইরে ঝর্নার ধারে নিয়ে আসা হলো ওকে। দিনের আলোয় লাশগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন ক্যাপ্টেন। লাশগুলোর দেহের কোথাও কোন ক্ষত চিহ্ন পাওয়া গেল না। তবে সবকটা দেহে একটা করে দগদগে লাল ঘায়ের মত দাগ দেখা গেল। দাগটা শরীরের কোন নির্দিষ্ট জায়গায় নয়। কারও বুকে, কারও পিঠে, কারও কাঁধে। ভালমত দাগগুলো পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ক্যাপ্টেন, 'বুঝেছি।'

'কি বুঝলেন, ক্যাপ্টেন? কি করে মারা গেল ডাকাতগুলো?' জিজ্ঞেস করলেন স্পিলেট।

'ইলেকট্রিক রাইফেল জাতীয় কোন অস্ত্রের সাহায্যে মারা হয়েছে ওদের।'

'ইলেকট্রিক রাইফেল!' স্তম্ভিত হয়ে বললেন স্পিলেট, 'কিন্তু এই অদ্ভুত কাজটা কে করল?'

'সেই রহস্যময় ত্রাণকর্তা ছাড়া আর কে?' আয়ারটনের দিকে ফিরে বললেন, 'আয়ারটন, ফ্র্যাঙ্কলিন হিলের গুহা থেকে তিনিই তোমাকে খোঁয়াড়ে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।'

লাশগুলোকে কবর দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল অভিযাত্রীরা। ওদের একটা প্রতিজ্ঞা পূরণ হলো।

'ট্যাবর দ্বীপে গিয়ে নোটিশটা রেখে আসতে হয় এবার,' মনে করিয়ে দিল পেনক্র্যাফট। 'নইলে ডানকান এসে ফিরে যেতে পারে।'

'কি করে যাবেন?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করল আয়ারটন।

'কেন, বন-অ্যাডভেঞ্চারে চড়ে।'

'ওটা এখন পানির তলায়। বন-অ্যাডভেঞ্চারে চড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল হারামজাদা ডাকাতেরা। চোরা জাহাজে ধাক্কা লেগে ভেঙে তলিয়ে গেছে

নৌকোটা।'

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল পেনক্র্যাফটের। হার্বার্ট সান্ত্বনা দিল ওকে, 'দুঃখ কোরো না, পেনক্র্যাফট। আর একটা নৌকো বানিয়ে নেব আমরা, বন-অ্যাডভেঞ্চারের চেয়েও বড়।'

'কিন্তু ওতে তো কয়েক মাস লেগে যাবে।'

'কি আর করা যাবে এ বছর আর ট্যাবর আইল্যাণ্ডে যাওয়া হলো না।' শান্তভাবে বললেন স্পিলেট।

তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ত্রাণকর্তার আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেল না। উনিশে ফেব্রুয়ারি, যে আগ্নেয় পাহাড়টার মাথায় চড়ে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডকে দ্বীপ বলে চিনেছিলেন ক্যাপ্টেন, সেই পাহাড়টার এক বিশাল গহ্বরে অভিযাত্রীরা হানা দিল। সুড়ঙ্গের অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে সবাই, এমন সময় শুরু শুরু মেঘ গর্জনের মত শব্দ হলো আগ্নেয়গিরির পেট থেকে

'সর্বনাশ,' চমকে উঠে বললেন স্পিলেট, 'আবার দেখছি জেগে উঠছে আগ্নেয়গিরি!'

তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সবাই। কিন্তু অগ্নুৎপাত করল না আগ্নেয়গিরি। এলাকাটা আবার চষে ফেলল অভিযাত্রীরা। কিন্তু পাওয়া গেল না রহস্যময় ত্রাণকর্তার আস্তানা। হতাশ হয়ে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এল সবাই।

ডাকাতেরা খেত খামার, পোলট্রি, উইণ্ডমিলের চূড়ান্ত ক্ষতি করে গেছে। সেগুলো ঠিক করার দিকে মন দিল এবার ওরা। দেশে ফিরে যাবার জন্যে ওদের আর মন খারাপ হয় না এখন। লিঙ্কন দ্বীপেই জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে চায় ওরা।

একদিন মন্তব্য করল হার্বার্ট, 'একবার দেশ থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়?' প্রস্তাবটায় সায় দিল সবাই। কিন্তু যেতে হলে একটা ছোটখাট জাহাজের দরকার। ঠিক হলো জাহাজ বানিয়ে নেয়া হবে। বানাতে সময় লাগবে সাত-আট মাস।

কাজে লেগে গেল পেনক্র্যাফট। একটা তিনশো টনী জাহাজের নক্সা এঁকে ফেলল সে। জাহাজের তক্তার জন্যে গাছ কাটা শুরু হলো এরপর।

একত্রিশ

পনেরোই মে জাহাজের খোল তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে আরও এগিয়ে চলল জাহাজের কাজ।

আবার শীত নামল লিঙ্কন দ্বীপে। শীতের পর বসন্ত। হঠাৎ সাতই সেপ্টেম্বরে ঘটল ঘটনাটা। ব্যাপারটা প্রথম ক্যাপ্টেনের চোখে পড়ল। ধোঁয়া বেরোচ্ছে ফ্র্যাঙ্কলিন হিলের চূড়া দিয়ে। সত্যিই তাহলে আবার জেগে উঠেছে আগ্নেয়গিরি। ক্রমশ বেড়েই চলল ধোঁয়ার পরিমাণ।

লিঙ্কন দ্বীপের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল পনেরোই অক্টোবর রাতে। খাওয়ার পর গল্প করছে সবাই। এমন সময় বেজে উঠল টেলিগ্রাফের বেল। স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। আজকাল গ্র্যানাইট হাউসেই থাকে আয়ারটন। তাছাড়া এখন ওদের সাথেই গল্প করছে ও। তাহলে কে বাজাল বেল?

আবার বাজল বেল, আবার। পর পর তিনবার। উঠে গিয়ে টেলিগ্রাফের চাবি টিপলেন ক্যাপ্টেন—অর্থাৎ জিজ্ঞেস করলেন, কে আপনি? কি চান?

উত্তর এল, 'এখুনি খোঁয়াড়ে চলে এসো।'

'যাক, অ্যাদ্দিনে রহস্যের মীমাংসা হতে চলেছে,' বলেই সবাইকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। অল্পক্ষণেই তৈরি হয়ে, জাপ আর টপকে গ্র্যানাইট হাউসে রেখে বেরিয়ে এল সবাই।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। তার ওপর আকাশে মেঘ করেছে। একটা তারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না আকাশের কোথাও। কোন কথা না বলে দ্রুত এগিয়ে চলল সবাই।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হলো। গম্ভীর, ভীষণ আওয়াজ করে দু'একটা বাজ পড়ল এদিক ওদিক। ঝড় আসতে বেশি দেরি নেই। খোঁয়াড়ে পা দিতেই এসে গেল ঝড়।

ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল সবাই। আলো জ্বালল নেব। কিন্তু কই? ঘরে তো কেউ নেই। টেবিলে রাখা চিঠিটা হার্বার্টের চোখে পড়ল। চিঠিটা তুলে ক্যাপ্টেনের হাতে দিতেই ভাঁজ খুলে পড়লেন তিনি, 'নতুন তার ধরে চলে এসো।'

সাথে সাথেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ক্যাপ্টেন। খোঁয়াড় থেকে টেলিগ্রাফ করা হয়নি। পুরানো তারের মাথায় একটা নতুন তার লাগিয়ে নিজের আবাসস্থল পর্যন্ত নিয়ে গেছেন ত্রাণকর্তা। সেখানে বসেই ডেকে পাঠিয়েছেন অভিযাত্রীদের।

খোঁয়াড়ের বাইরে এসে মশালের আলোয় ক্যাপ্টেন দেখলেন, প্রথম খুঁটির পুরানো তারের সাথে একটা নতুন তার লাগানো রয়েছে। মাটির ওপর দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেছে তারটা।

তারটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল অভিযাত্রীরা। কখনও গাছের নিচু ডাল, কখনও মাটির ওপর দিয়ে চলে গেছে তারটা। উপত্যকায় এসেও শেষ হলো না তার। পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে গেল সাগরের দিকে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে। বিকট শব্দে পাহাড়ের মাথায় বাজ পড়ল একটা। প্রলয়ের রাত যেন এটা।

রাত এগারোটায় দ্বীপের পশ্চিমে পৌঁছে গেল অভিযাত্রীরা। পাঁচশো ফুট নিচে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে সাগর। এখান পর্যন্ত এসে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে তারটা। দুর্গম জায়গা তবু তার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলল ওরা। পাহাড়ের ফাটল পেরিয়ে পানির ধারে চলে এল অভিযাত্রীরা, থমকে দাঁড়াতে হলো এখানে। সোজা পানিতে নেমে গেছে তার। ত্রাণকর্তা তাহলে পানির দেশের বাসিন্দা! কিন্তু কি করে যাওয়া যায় ওখানে? সবার মনোভাব বুঝতে পেরে আশ্বাস দিলেন ক্যাপ্টেন, 'ভাবনার কিছু নেই। ভাটার টানে পানি নেমে গেলেই আবার তারটাকে অনুসরণ করতে পারব আমরা।'

হঠাৎ শুরু হলো অঝোর বর্ষণ। একটা গুহায় আশ্রয় নিল অভিযাত্রীরা। অনেক, অনেকক্ষণ পর বৃষ্টি কিছুটা ধরে এলে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। জোয়ারের পানি ততক্ষণে সরে গেছে।

ঠিকই বলেছিলেন ক্যাপ্টেন। একটু আগে যেখানে পানি ছিল সেখানে এখন একটা বিশাল সুরঙ্গ-মুখ দেখা যাচ্ছে। মশালের আলোয় তারটাকে অনুসরণ করে সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল অভিযাত্রীরা। প্রায় আট ফুট উঁচু খিলানের মত গুহামুখের ভেতর ঢুকেই আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। আর এগোনো যাবে না। ওদের সামনে আবার সাগরের পানি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু দূরের পানিতে কালো মত কিছু একটা ভাসছে। আলো হাতে পানি ভেঙে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। এবার চিনতে পারলেন কালো বস্তুটাকে—একটা নৌকো।

হাত বাড়িয়ে নৌকোর গলুই ধরে ওটাকে সঙ্গীদের কাছে টেনে নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। লোহার পাত দিয়ে মোড়া নৌকোটায় দুটো দাঁড়। ওপাশের গলুইয়ে আটকানো শেকলের অন্য মাথা একটা পাথরের সাথে বেঁধে নৌকোটাকে যথাস্থানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সবাইকে নৌকোয় ওঠার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। সবাই নৌকোয় উঠে বসল। আয়ারটন আর পেনক্র্যাফট দাঁড় টানতে শুরু করল। ধনুকের মত বেঁকে ওপরে উঠে গেল সুড়ঙ্গের ছাদ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে মশালের আলোয় দুরু দুরু বুকে সুড়ঙ্গের ভেতর এগিয়ে চলল অভিযাত্রীরা। তারটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। অনুমান করলেন ক্যাপ্টেন, সুড়ঙ্গের ভেতরেই কোথাও না কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে তার।

আর একটু সামনে গিয়েই আবার চোখে পড়ল তারটা। সুড়ঙ্গের গায়ের বেরিয়ে থাকা পাথরের খাঁজে ঝুলে ঝুলে এগিয়ে গেছে তারটা। আরও প্রায় আধ মাইল যাওয়ার পর ডান দিকে মোড় নিল সুড়ঙ্গ। মোড় ঘুরতেই অভিযাত্রীদের চোখে পড়ল অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আলোটা।

বিশাল কালো গহ্বরটার কোথাও এখন আর একরত্তি অন্ধকার নেই সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে ওই অত্যুজ্জ্বল আলো।

'এ কিসের আলো?' জিজ্ঞেস করল হার্বার্ট।

'ইলেকট্রিক আলো বলেই মনে হয়,' উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন।

এখানেও শেষ হয়নি তার। এগিয়ে গেছে সামনে। এগিয়ে চলল অভিযাত্রীরাও। ক্রমশ চওড়া হতে হতে এক সময় শেষ হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। সামনে বিশাল হ্রদ। পাতালের হ্রদ। প্রকাণ্ড একটা তিমি ভাসছে হ্রদের পানিতে। এখানে তিমি এল কোত্থেকে? থামল না অভিযাত্রীরা। সাহস করে তিমিটার দিকেই এগিয়ে চলল। আরও কাছে যাওয়ার পর বোঝা গেল ওটা তিমি নয়।

অনেকটা চুরুটের মত গড়ন ওটার। দু'পাশে ছুঁচালো। মাথার দু'পাশ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। প্রায় আড়াইশো ফুট লম্বা দশ-বারো ফুট উঁচু কুচকুচে কালো প্রকাণ্ড বস্তুটা স্থির হয়ে ভাসছে হ্রদের পানিতে।

আরও এগিয়ে গেল স্তম্ভিত অভিযাত্রীরা। উত্তেজনায় হঠাৎ খপ করে স্পিলেটের হাত চেপে ধরলেন ক্যাপ্টেন! ফিস ফিস করে বললেন, 'বুঝেছি। এ হচ্ছে সেই লোক। কিংবদন্তীর মত প্রায়ই এঁর কথা কানে এসেছে আমার।'

স্পিলেটের কানে কানে একটা নাম বললেন ক্যাপ্টেন। শুনে তড়িতাহতের মত চমকে উঠলেন স্পিলেট। ফিস ফিস করেই বললেন তিনিও, 'কিন্তু···কিন্তু তিনি যে ক্রিমিনাল। ফেরারী আসামী। পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে আইনের খাঁড়া ঝুলছে তাঁর মাথার ওপর।'

'হ্যাঁ, তিনিই ডেকে পাঠিয়েছেন আমাদের,' গম্ভীরভাবে বললেন ক্যাপ্টেন।

ভাসমান অতিকায় বস্তুটার গায়ে এসে নৌকো ভিড়ল। দলবল নিয়ে নৌকো থেকে ওটার ওপর নামলেন ক্যাপ্টেন। বস্তুটার ঠিক পিঠের ওপর একটা গোল ধাতব ঢাকনা। ঢাকনাটা তুলতেই দেখা গেল লোহার সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন, পিছন পিছন অনুসরণ করল আর সবাই। একটা গোল চত্বরের মত জায়গায় শেষ হয়েছে সিঁড়ি। ইলেকট্রিক আলোয় ঝলমল করছে জায়গাটা। চত্বরের অন্যপ্রান্তের দরজাটা খুললেন ক্যাপ্টেন। সুসজ্জিত একটা ঘর। সেটার পরের ঘরটা লাইব্রেরি। লাইব্রেরির অন্য প্রান্তের দরজা খুলে বিশাল হলরুমে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন। বিলাস বহুল বড় বড় যাত্রীবাহী জাহাজের সেলুনের চাইতেও দামী জিনিসে সাজানো ঘরটা।

ঘরের ভেতরে একটা দামী সোফায় আধশোয়া হয়ে আছেন একজন লোক। সোজা সেদিকে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। সোফায় শোয়া লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমরা এসেছি, ক্যাপ্টেন নিমো।'

বত্রিশ

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন ক্যাপ্টেন নিমো। ব্যক্তিত্বপূর্ণ চাহনি দেখলেই বোঝা যায় শুধু হুকুম করতেই জন্মেছে ওই লোক। ঘাড়ের ওপর লুটাচ্ছে ধবধবে সাদা চুল, মুখভর্তি দাড়ি। মলিন মুখ, রোগে কাহিল হয়ে পড়েছেন বোধহয় ক্যাপ্টেন নিমো, শান্ত কণ্ঠে ইংরেজিতে কথা বললেন তিনি, 'আমার নাম জানলেন কি করে, ক্যাপ্টেন হার্ডিং?'

'শুধু আপনার নামই নয়, আশ্চর্য এই ডুবোজাহাজের কাহিনীও জানি।'

'নটিলাস?'

'নটিলাস।'

'কিন্তু আমার কথা তো পৃথিবীর কারও জানার কথা নয়।'

'আপনার নাম জানে পৃথিবীর লোক।'

'বুঝেছি। কয়েক বছর আগে ঘটনাচক্রে আমার জাহাজে এসে পড়া প্রফেসারই রটিয়েছে আমার নাম।'

'প্রফেসার অ্যারোনাক্সের কথা বলছেন তো?'

'হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম নরওয়ের ঘূর্ণিপাকে পড়ে দুই সঙ্গীসহ মারা গেছেন ভদ্রলোক।'

'মরতে মরতেও বেঁচে যান। দেশে ফিরে "টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী" নামে একটা বই লেখেন। বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেছেন প্রফেসার আর তাঁর বই।'

'কিন্তু ও বইয়ে তো আমার জীবনের মাত্র দশ মাসের ঘটনা লেখা থাকার কথা।'

'তাই আছে। আর তাতেই পৃথিবীর মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন আপনি।'

'ক্রিমিনাল হিসেবে স্মরণীয়, তাই না, ক্যাপ্টেন?'

'ক্যাপ্টেন নিমো, আপনি ক্রিমিনাল কিনা সে বিচারের দায়িত্ব আমার নয় তবে আমরা লিঙ্কন দ্বীপে আসার পর আপনি আমাদের জন্যে যা যা করেছেন তাতে আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি না। আমাদের কাছে আপনি মহাপুরুষ।'

হার্ডিংয়ের কথায় মৃদু হাসলেন ক্যাপ্টেন নিমো।

'ক্যাপ্টেন নিমো,' এবার সামনে এগিয়ে এলেন স্পিলেট, 'আমি সাংবাদিক। আর পৃথিবীর সব সাংবাদিকই কম বেশি কৌতূহলী। তাই আপনার আসল পরিচয় জানার ইচ্ছেটা দমন করতে পারছি না আমি। দয়া করে যদি তা জানান নিজেকে ধন্য মনে করব।'

স্পিলেটের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নিমো। তারপর সবাইকে বসতে বলে শুরু করলেন নিজের কাহিনী।

'আমার আসল নাম ডাক্কার, প্রিন্স ডাক্কার। ভারতের বুন্দেলখণ্ডে রাজপুত্র হয়ে জন্মেছিলাম আমি।'

'দশ বছর বয়সেই উচ্চশিক্ষার জন্যে বাবা আমাকে বিলেতে পাঠালেন তাঁর ইচ্ছা, ফিরে এসে ইউরোপের দেশগুলোর ছাঁচে বুন্দেলখণ্ডকে উন্নত করে তুলব আমি। দশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে বিজ্ঞান, সাহিত্য আর এঞ্জিনীয়ারিংএ অনেক জ্ঞান লাভ করলাম, ঘুরে বেড়ালাম সাড়া ইউরোপে। রাজার ছেলে আমি। অর্থের অভাব নেই। কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ-ভোগবিলাসের প্রতি কোন লালসাই ছিল না আমার। শুধু জ্ঞানের পিপাসা সারাক্ষণ অস্থির করে রাখত আমাকে।

'১৮৪৮ সালে স্বদেশে ফিরে এলাম। যথাসময়ে বিয়ে করার পর দুটো বাচ্চাও হলো। কিন্তু সংসারে মন টিকল না আমার

'ভারত জুড়ে শুরু হলো সিপাহী বিদ্রোহ। বিদ্রোহে যোগ দিলাম আমি। দশবার জখম হলাম বিশটা যুদ্ধে। কিন্তু ব্যর্থ হলো সিপাহী বিদ্রোহ, হেরে গেল বিদ্রোহীরা প্রিন্স ডাক্কারের নাম জেনে ফেলেছে ইংরেজ সরকার আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হলো।

'বুন্দেলখণ্ডের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে গেলাম আমি। সভ্য মানুষ বিশেষ করে সাদা চামড়ার মানুষ জাতটার প্রতি বিষিয়ে গেল মনটা। কুড়িজন একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর আর আমার সমস্ত অর্থ সম্পদ নিয়ে একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলাম আমি।

'কিন্তু কোথায় গেলাম? সাগর তলায় সাদা চামড়ারা আমার পিছু নিতে পারবে না যেখানে।

'সৈনিক থেকে রূপান্তরিত হলাম বৈজ্ঞানিকে। প্রশান্ত মহাসাগরের এক মরুদ্বীপে বসে বানালাম আমার ডুবো জাহাজ নটিলাসকে। তারপর ডুব দিলাম সাগরের অতল তলায়। বছরের পর বছর পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম আমি।

'অফুরন্ত ধনরত্নের কোষাগার এই সাগর। কোটি কোটি টাকা মূল্যের সোনা আর মণিমুক্তা তুলে গোপনে দান করে দিতে লাগলাম ভারতবর্ষ আর অন্যান্য দরিদ্র দুর্ভাগা দেশকে—স্বাধীনতার জন্যে যারা মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছে।

'ভালই চলছিল। হঠাৎ নটিলাসে এসে আশ্রয় নিলেন প্রফেসার অ্যারোনাক্স আর তাঁর দুই সঙ্গী। ওঁদেরকে মেরে ফেলতে পারতাম আমি। কিন্তু না মেরে নটিলাসেই রেখে দিলাম এক শর্তে—কোনদিন আর বাইরের পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবেন না ওঁরা।

'কিন্তু দশ মাস পরে নরওয়ের কুখ্যাত মেলস্ট্রমে গিয়ে পড়ল জাহাজ। নটিলাসকে রক্ষা করতে আমরা সবাই ব্যস্ত, এই সুযোগে দুই সঙ্গীসহ পালিয়ে যান প্রফেসার অ্যারোনাক্স।

'তারপরও সাগরে সাগরে ঘুরে বেড়ালাম আমি। একে একে মারা গেল প্রত্যেকটি বিশ্বস্ত অনুচর। শেষ পর্যন্ত বেঁচে রইলাম শুধু আমি, একা। আমার বয়স তখন ষাট। এ বয়সেও একাই নটিলাসকে চালিয়ে গেলাম আমি। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন আপনাদের দ্বীপের এই গহ্বর আবিষ্কার করে ফেললাম। ভাবলাম নটিলাসের জন্যে এ গহ্বর একটা বন্দরের কাজ দেবে। এ রকম গুপ্ত বন্দর নটিলাসের আরও আছে।

'মাঝে মাঝে আসি, এখানে বিশ্রাম নিই। চলে যাই। হঠাৎ একদিন আটকা পড়ে গেলাম। গহ্বরে ঢোকার পর বিশ্রাম করছিল নটিলাস, এমন সময় দ্বীপের আগ্নেয়গিরিটা অগ্ন্যুৎপাত শুরু করল। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নটিলাসের বাইরে বেরোবার সুড়ঙ্গ পথটা বন্ধ হয়ে গেল। চিরদিনের মত এখানে আটকা পড়ে গেল

নটিলাস।

'গত কয়েক বছর ধরে আছি আমি এখানে। আটকা পড়েই বুঝতে পেরেছিলাম, এই দ্বীপেই মৃত্যু হবে আমার। অপেক্ষা করছি মৃত্যুর।

'হঠাৎ একদিন দেখলাম কয়েকজন লোককে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আকাশ থেকে পড়ছে একটা বেলুন। ডুবুরীর পোশাক পরা অবস্থায় তখন সাগর তীরের অল্প পানিতে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম বেলুন থেকে পানিতে পড়ে গেছেন ক্যাপ্টেন হার্ডিং সাগরের তলা দিয়ে গিয়ে পানি থেকে ওঁকে তুলে একটা পাহাড়ের গুহায় রেখে আসি আমি।

'আড়াল থেকে আপনাদের ওপর নজর রাখলাম। বুঝলাম, আপনারা পরিশ্রমী, সৎ এবং পরস্পরকে ভালবাসেন। ডুবুরীর পোশাক পরে হ্রদের পানি সাগরে পড়ার গোপন সুড়ঙ্গপথে গ্র্যানাইট হাউসের কুয়োর তলায় চলে যেতাম। কুয়োর দেয়াল বেয়ে উঠে আপনাদের সমস্ত কথাবার্তা শুনতাম। দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্যে লড়ে এসেছেন, আপনাদের আলোচনা শুনে তাও জানলাম। ব্যস, আর কিছু শোনার দরকার ছিল না আমার। আপনাদের মত লোকই আমার পছন্দ। আড়ালে থেকে যদ্দূর সম্ভব সাহায্য করে গেলাম আপনাদের।' এই পর্যন্ত বলে থামলেন ক্যাপ্টেন। রোগাক্রান্ত শরীরে একটানা এতক্ষণ কথা বলার পরিশ্রমে অল্প অল্প হাঁপাচ্ছেন তিনি। প্রশস্ত কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

এবার বুঝলেন ক্যাপ্টেন হার্ডিং, বেলুন থেকে পড়ে যাবার পর ওঁকে কে বাঁচিয়েছেন। ওঁকেই শুধু বাঁচাননি ক্যাপ্টেন নিমো, ঝড় বাদলার রাতে অয়েল পেপারে ঢেকে টপকে চিমনিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন, হ্রদের পানিতে ডুগংটাকে হত্যা করে টপকে বাঁচিয়েছেন, দরকারী জিনিসপত্র সিন্দুকে ভরে সাগর তীরে রেখে এসেছেন, গভীর রাতে নৌকোর বাঁধন কেটে ওটাকে মার্সি নদী বেয়ে ওদের সামনে পৌঁছে দিয়েছেন, ওরাং ওটাংরা গ্র্যানাইট হাউস আক্রমণ করার সময় ওপর থেকে সিঁড়ি ফেলে দিয়েছেন, আয়ারটনের খবর লিখে বন-অ্যাডভেঞ্চারের কাছে বোতল ভাসিয়ে দিয়েছেন, প্রসপেক্ট হাইটের মাথায় চড়ে আলোর সংকেত দেখিয়ে পেনক্র্যাফটকে দ্বীপে ফিরে আসার পথ চিনিয়েছেন, স্পীডির নিচে টর্পেডো মেরে ধ্বংস করেছেন জাহাজটাকে, হার্বার্টের জন্যে কুইনিন সরবরাহ করেছেন, ইলেকট্রিক রাইফেলের সাহায্যে পাঁচটা ডাকাতকে মেরে ওদেরকে বিপদমুক্ত করেছেন। তাঁর উপকারের ঋণ অভিযাত্রীরা কোন দিন শোধ করতে পারবে না।

হার্ডিংকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন নিমো, 'আমার কাহিনী শোনার পর আমার সম্পর্কে কি ধারণা হয় আপনার?'

'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী' বইয়ে লেখা একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল হার্ডিংয়ের। একটা জাহাজডুবির ঘটনা। সেবার অসহায় শিশুসহ মায়েদের পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল নটিলাস। পৃথিবীর সব দেশে ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। আর এরপর এত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন ক্যাপ্টেন যে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ভাসতে ভাসতে ঘূর্ণিপাকে গিয়ে পড়েছিল নটিলাস।

হার্ডিংয়ের মনের কথাটা যেন বুঝতে পেরে বললেন ক্যাপ্টেন নিমো, 'সেই জাহাজটার কথা ভাবছেন তো? কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন আমি ওটাকে ধাওয়া করিনি, ওটাই তেড়ে আক্রমণ করেছিল আমাকে। শেষ পর্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অগভীর একটা উপসাগরে আটকা পড়েছিলাম আমি। পালাবার পথ ছিল না। বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে জাহাজটাকে ডোবাতে হয়েছিল আমাকে। কাজটা কি অন্যায় করেছিলাম?'

'আগেই বলেছি, আপনার কাজের বিচার বা সমালোচনা করার অধিকার আমার নেই,' ক্যাপ্টেন নিমোর প্রশ্নের জবাবে বললেন হার্ডিং। 'মানুষ তো নিজে

কিছু করছে না, করাচ্ছেন তিনি।' আঙুল তুলে ওপর দিকে নির্দেশ করলেন তিনি। 'আমরা যন্ত্র, তিনি চালক। আমাদের বিচারের ভারটাও তাই তাঁর। শুধু একটা কথাই বলছি আপনাকে, ক্যাপ্টেন নিমো, আপনার মত পরোপকারী, নিঃস্বার্থ বন্ধু পেলে যে কোন মানুষ নিজেকে ধন্য মনে করবে। আমরাও তাই মনে করছি।'

হাঁটু গেড়ে ক্যাপ্টেন নিমোর পাশে বসে তাঁর হাতে চুমু খেলেন হার্ডিং। চোখে পানি এসে গেল নিমোর। হার্ডিং-এর মাথায় একটা হাত রেখে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন নিমো, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

ভোর হতেও দিনের আলো গহ্বরে প্রবেশ করল না। নটিলাসের সবকিছু ঘুরে ঘুরে অভিযাত্রীদের দেখালেন ক্যাপ্টেন নিমো। মিউজিয়ামের মাথায় বড় বড় অক্ষরে লেখা মহান বাণীটা (Mobilis mobile) দেখাবার পর আর পারলেন না। পরিশ্রান্ত ভাবে সোফায় এলিয়ে পড়লেন।

তাড়াতাড়ি ক্যাপ্টেন নিমোর নাড়ি পরীক্ষা করলেন স্পিনলেট। হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত ক্ষীণ।

'ওঁকে বাইরে নিয়ে গেলে ভাল হত না?' জিজ্ঞেস করল পেনক্র্যাফট।

'নটিলাস ছেড়ে এ সময়ে কোথাও যাবেন না উনি,' উত্তর দিলেন হার্ডিং।

একটু পর চোখ মেলে চাইলেন ক্যাপ্টেন নিমো। বললেন, 'ঠিক বলেছেন, এখানেই মরতে চাই আমি। খুব সম্ভব আগামী কালই মারা যাব আমি। মৃত্যুর পর আমার একটা শেষ ইচ্ছে পূরণ করবেন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং?'

'নিশ্চয়ই করব,' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন হার্ডিং। 'বলুন, কি?'

'আমার ইচ্ছে, নটিলাসই হবে আমার কফিন। এখানটায় পানি খুব গভীর। আমার মৃতদেহ নিয়ে চিরদিনের মত পানিতে ডুব দেবে নটিলাস।

'আমার মৃত্যুর পর আপনারা চলে যাবেন এ গহ্বর ছেড়ে। এক বাক্স হীরা দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে নিন।' টেবিলের ড্রয়ার খুলে হীরার বাক্সটা এগিয়ে দিয়ে আবার বলতে লাগলেন ক্যাপ্টেন নিমো, 'সাগর থেকে সংগ্রহ করা মূল্যবান কিছু হীরা আছে এর মধ্যে। আমার ইচ্ছে কোন সৎ কাজে খরচ করবেন আপনারা এ সম্পদ। এছাড়া নটিলাসে আর যা কিছু আছে সব নটিলাসেই থাকবে।

'আমার মৃত্যুর পর এ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেবেন। তারপর নটিলাসের বাইরে বেরিয়ে শক্ত করে ডালাটা আটকে দেবেন। যাতে একফোঁটা পানিও ভেতরে ঢুকতে না পারে। এরপর যে নৌকো করে এসেছেন সেটায় চড়ে নটিলাসের সামনের দিকে যাবেন। ভাল মত খেয়াল করলে দেখবেন ওখানে স্টপকক লাগানো দুটো ছিদ্র আছে। স্টপকক দুটো খুলে দিলেই আস্তে আস্তে পানিতে ভরে যাবে নটিলাসের ট্যাঙ্ক। গভীর পানির তলায় তলিয়ে যাবে আমার সাধের ডুবোজাহাজ। কথা দিন, যা বললাম অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন?'

'কথা দিচ্ছি, ক্যাপ্টেন নিমো।' আবেগে প্রায় বুজে এল হার্ডিং এর গলার স্বর।

'ক্যাপ্টেন হার্ডিং, এবার আপনার সাথে কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই আমি।'

ক্যাপ্টেন নিমোর কথা শুনে হার্ডিং ছাড়া বাকি সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দু'জনের মধ্যে কি কথাবার্তা হলো তার কিছুই জানতে পারল না কেউ।

সেদিন নটিলাসেই থেকে গেল অভিযাত্রীরা। আস্তে আস্তে ক্যাপ্টেন নিমোর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকল। রাত বারোটার পর বহু কষ্টে হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখলেন ক্যাপ্টেন নিমো। সবাই বুঝল সময় ফুরিয়ে এসেছে ওঁর।

রাত একটার দিকে আবার চোখ দুটো মেললেন ক্যাপ্টেন। মুহূর্তের জন্যে চক

চক করে উঠল চোখ দুটো। বিড় বিড় করে শুধু বললেন, 'জন্মভূমিকে রক্ষা করো। ঈশ্বর!' বলেই চোখ বুজলেন ক্যাপ্টেন নিমো। পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন যেন।

সবাই বুঝল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ক্যাপ্টেন নিমো। লাশের গায়ে একটা চাদর টেনে দিয়ে বললেন হার্ডিং, 'ওঁর আত্মার মঙ্গল করো তুমি, ঈশ্বর!'

হু হু করে কেঁদে ফেলল হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফট। শব্দ করে কাঁদল না আয়ারটন, কিন্তু অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ছে ওর দু'গাল বেয়ে। পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নেব।

একটু পর শুধু হীরার বাক্সটা নিয়ে সে-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল অভিযাত্রীরা। ক্যাপ্টেন নিমোর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। নটিলাসের বাইরে এসে ডালাটা শক্ত করে এঁটে দিয়ে নৌকোয় চেপে বসল অভিযাত্রীরা।

নটিলাসের সামনের ফুটো দুটো খুঁজে বের করলেন হার্ডিং। স্টপকক দুটো খুলে দিতেই হু হু করে পানি ঢুকতে লাগল নটিলাসের ট্যাঙ্কে। চোখের সামনে, ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল প্রিন্স ডাক্কারের ডুবোজাহাজ কফিন—নটিলাস।

তেত্রিশ

সুড়ঙ্গ মুখে পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল। নৌকোটাকে সুড়ঙ্গ মুখের একটা পাথুরে তাকে রেখে বাইরে বেরিয়ে এল অভিযাত্রীরা। গুপ্ত গহ্বরটার নাম রাখা হলো ডাক্কার গহ্বর। বিষণ্ন মনে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে চলল সবাই।

বড় নৌকোটা তৈরির কাজে এবার জোর দিল পেনক্র্যাফট। সবাই সাহায্য করল ওকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেলতে হবে নৌকোর কাজ। ট্যাবর আইল্যাণ্ডে গিয়ে নোটিস না রেখে এলে, এসে ফিরে যাবে ডানকান।

দেখতে দেখতে আবার এল জানুয়ারি মাস। মাসের প্রথম তারিখেই যেন খেপে গেল লিঙ্কন দ্বীপের প্রকৃতি। এল উন্মত্ত ঝড়, ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল অসংখ্য গাছপালা।

জানুয়ারির তিন তারিখে ফ্র্যাঙ্কলিন হিলের চূড়া থেকে আবার ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল উপরের আকাশ।

ব্যাপার দেখে সবাইকে ডেকে বললেন হার্ডিং, 'কথাটা আর গোপন করে লাভ নেই। ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।'

মাটিতে কান পেতে শুনল আয়ারটন, প্রচণ্ড গুম গুম শব্দ হচ্ছে মাটির তলায়। 'শুনছ নাবিক, খেপে গেছে ফ্র্যাঙ্কলিন হিল।'

'জাহান্নামে যাক ফ্র্যাঙ্কলিন হিল।' খেপে গেছে পেনক্র্যাফটও। 'ধোঁয়া বেরোক চাই আগুন বেরোক। নৌকোর কাজ বন্ধ করা যাবে না।'

পাহাড়ের চূড়ায় আগুন দেখা গেল, সন্ধের পর। যেন একটা অতিকায় মশাল জ্বলছে পাহাড়ের মাথায়। ছাই, বাষ্প আর ধোঁয়ায় আড়াল হয়ে গেছে তারাজ্বলা আকাশ। মাঝে মাঝে অনেকগুলো মেশিনগানের একটানা আওয়াজের মত শব্দ আসছে পাহাড়ের দিক থেকে।

'সর্বনাশ!' সব দেখে শুনে বললেন হার্ডিং, 'এত জলদিই শুরু হয়ে গেল!'

আরও একটা উপসর্গ দেখা দিল কিছুক্ষণ পর। ভূমিকম্পের মত কাঁপছে দ্বীপের মাটি।

পরের তিনদিন একনাগাড়ে ধূম্র উদগীরণ করে চলল ফ্র্যাঙ্কলিন হিল। তবে নৌকো তৈরির কাজও চলল একটানা। এরই মাঝে সময় করে খোঁয়াড়ের জানোয়ারগুলোকে খাবার দিয়ে এলেন হার্ডিং আর আয়ারটন

চতুর্থ দিনে আকাশ থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরতে লাগল কয়লার গুঁড়োর মত কালো একরকম গুঁড়ো। দেখতে দেখতে মাটি ঢেকে গেল কয়েক ইঞ্চি পুরু গুঁড়োয়। আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে ধোঁয়ার সাথে আকাশে উঠে যাচ্ছে ঝামার গুঁড়ো, তাই আবার ঝরে পড়ছে নিচে। আগুনে পোড়া ধাতুর পরিত্যক্ত মলও বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। অগ্ন্যুৎপাতের বেশি দেরি নেই আর।

আগ্নেয়গিরির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে বেরোলেন ক্যাপ্টেন হার্ডিং। রেডক্রীক পেরিয়ে গন্ধকের ঝর্নার কাছে গিয়ে দেখলেন আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে গোটা এলাকার। আশেপাশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আরও অনেক প্রস্রবণ। ভেতর থেকে, যেন দুরমুশের ঠেলায় ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে উপরের মাটির স্তর। দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস, কার্বনিক অ্যাসিড আর ঘন বাষ্পের জন্যে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তবে লাভার স্রোত নামেনি এখনও।

সেদিন সকাল দশটা নাগাদ আয়ারটনকে নিয়ে ডাক্কার গহ্বরের দিকে চললেন ক্যাপ্টেন। জায়গামত পৌঁছে পাওয়া গেল নৌকোটা। হালকা নৌকোটা পাথরের তাক থেকে নামিয়ে আনল আয়ারটন।

নৌকোয় করে বিশাল পাতালের লেকটার শেষ প্রান্তে চলে গেল দু'জনে। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সাথে আনা মশালের আলোয় পথ দেখে চলতে হচ্ছে ওদের। মৃত্যুপুরীর মত নিস্তব্ধ পাতালের গহ্বরে মাঝে মাঝে গম্ভীর গুরু গুরু মেঘ গর্জনের মত শব্দ হচ্ছে।

দাঁড়ের মাথায় মশাল বেঁধে সুড়ঙের ছাদ পরীক্ষা করলেন ক্যাপ্টেন। ফেটে চুরচুর হয়ে গেছে পাথরের ছাদ। আগ্নেয়গিরির কেন্দ্রস্থলকে ঢেকে রেখেছে পাথরের দেয়াল। কতটা পুরু এ দেয়াল? দশ, বিশ, একশো ফুট? কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এক সময় যথেষ্ট পুরু থাকলেও এখন আর ততটা পুরু নেই পাথরের দেয়াল। তাছাড়া ফেটে যাওয়া দেয়ালের ফাঁক দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে এসে ক্রমে দূষিত করে তুলছে সুড়ঙ্গের বাতাস। পানির মাত্র তিন চার ফুট উপরে নেমে এসেছে একশো ফুট উঁচু ছাদ। স্তম্ভিত হয়ে দৃশ্যটা দেখলেন ক্যাপ্টেন। আয়ারটনকে বললেন, 'তোমাদেরকে বের করে দিয়ে এই বিপদের কথাটাই আমাকে জানিয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন নিমো। তোমরা শুনলে যদি আবার ভয় পেয়ে যাও, তাই আগে থেকে শোনাতে নিষেধ করে গেছেন তিনি।'

আবার সুড়ঙ্গ মুখে ফিরে এল দু'জনে।

পরদিন আটই জানুয়ারি সবাইকে ডেকে বিপদের কথাটা জানালেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'মৃত্যুর আগে একটা খবর দিয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন নিমো। খবরটা হলো, যে-কোনদিন সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে লিঙ্কন আইল্যাণ্ড। আগ্নেয়গিরির কেন্দ্রস্থল আর সাগরের পানি এ দুটোর ভেতর ব্যবধান শুধু একটা দেয়ালের, ডাক্কার গহ্বরের দেয়াল। ভেতরের লাভাস্রোত প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে দেয়ালের গায়ে দেয়ালটা ভেঙে গেলে সাগরের পানি গিয়ে ঢুকবে আগ্নেয়গিরির ভেতর। ফলটা কি দাঁড়াবে, বলতে পারো?'

'নিভে যাবে আগুন।' নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল পেনক্র্যাফট।

'না, পেনক্র্যাফট, ব্যাপারটা অত সহজ হলে ভাবনার কিছু ছিল না। উত্তপ্ত লাভার ওপর পানি পড়লে মুহূর্তে তা বাষ্পে পরিণত হবে। ওই বাষ্প বেরোবার পথ

না পেয়ে প্রচণ্ড চাপে ফাটিয়ে দেবে সমস্ত পাহাড়টা। কিন্তু তখনও ঠাণ্ডা হবে না লাভাস্রোত। হু হু করে সাগরের পানি পড়বে গিয়ে ওতে, আরও বাষ্প তৈরি হবে, বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার মত চুরমার হয়ে যাবে লিঙ্কন দ্বীপ।'

এবার বুঝল অভিযাত্রীরা, কি সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘনিয়ে আসছে ওদের সামনে। ডাক্কার গহ্বরের পাথুরে দেয়াল যতক্ষণ উত্তপ্ত লাভার প্রলয়ঙ্করী চাপ সহ্য করে টিকে থাকতে পারবে, ততক্ষণ আয়ু আছে ওদের। কিন্তু আর কয়দিন টিকবে ডাক্কার গহ্বরের দেয়াল? কয়েক মাস। কয়েক দিন, না কি কয়েক ঘণ্টা?

এখন খেটেখুটে জাহাজটা তৈরি করে ফেলতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। সব ভুলে জাহাজ তৈরির কাজে মন দিল অভিযাত্রীরা।

জাহাজের ডেক তৈরির কাজ শেষ হলো তেইশে জানুয়ারি। মাঝখানের ক'টা দিন নতুন কোন উৎপাত করেনি আগ্নেয়গিরি, কিন্তু সেদিন রাত দুটোয় একটা ভয়ঙ্কর শব্দে কানে তালা লেগে গেল অভিযাত্রীদের। সেই সাথে শুরু হলো প্রচণ্ড ভূকম্পন।

গ্র্যানাইট হাউসের জানালা দিয়ে উঁকি দিল সবাই। ফ্র্যাঙ্কলিন হিলের চুড়োটা উড়ে গেছে। সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে লকলকে আগুনের শিখা। বিশাল একটা দাবানল জ্বলছে যেন পাহাড়ের মাথায়। সেই সাথে নেমে আসছে উত্তপ্ত লাভাস্রোত। লক্ষ জিহ্বা মেলে, প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়ে নাচতে নাচতে খোঁয়াড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে তরল আগুনের স্রোত। তক্ষুণি গাড়ি নিয়ে খোঁয়াড়ের দিকে ছুটল অভিযাত্রীরা। খোঁয়াড়ে পৌঁছেই গেট খুলে দিয়ে দূরে সরে এল ওরা। একছুটে খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকল ভীত জানোয়ারের দল। পরক্ষণেই খোঁয়াড়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল ফুটন্ত লাভার স্রোত। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখল অভিযাত্রীরা, পেছনের ঝর্নাটায় উত্তপ্ত লাভা পড়তেই ছ্যাঁৎ করে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল ঝর্নার সমস্ত পানি। পুড়ে ছারখার হয়ে গেল খোঁয়াড়টা।

ভোর হতে হতেই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল গলিত লাভা। আগুন লেগে গেল বনে। সাতটা নাগাদ আর থাকা গেল না সে অঞ্চলে। হ্রদের পাড়ে সরে এল অভিযাত্রীরা। কিছুটা সময় অন্তত ওই তরল আগুনকে ঠেকিয়ে রাখবে হ্রদের পানি।

মুহুর্মুহু বজ্র গর্জনের মত প্রচণ্ড গর্জনে কাঁপছে চারদিক, চ্যাপ্টা টেবিলের মত বিশাল দুটো জ্বালামুখ দিয়ে এক নাগাড়ে বেরিয়ে চলেছে আগুন, ছাই, লাভা। হ্রদের পাড়ে প্রায় পৌঁছে গেছে লাভাস্রোত।

'পেনক্র্যাফট!' চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'জলদি যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে এসো। বাঁধ দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে লাভাস্রোত। সমস্ত লাভাটাই পানিতে গিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

সাথে সাথেই ছুটল পেনক্র্যাফট। ডকইয়ার্ড থেকে কুড়াল গাঁইতি এনে কাঠ কাটতে শুরু করল। ফুট তিনেক উঁচু একটা বাঁধ তৈরি শেষ হলো। পরিশ্রমে কুকুরের মত জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে সবাই।

আর একটু পরই যাত্রাপথের সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বাঁধের কাছে পৌঁছে গেল লাভার স্রোত। সামনে বাধা পেয়ে মোড় ঘুরে পানির দিকে চলে গেল লাভা। প্রায় বিশ ফুট উপর থেকে জলপ্রপাতের মত হ্রদের পানিতে ঝরে পড়ছে লাভাপ্রপাত। শুরু হয়ে গেল প্রলয়কাণ্ড। হাজার হাজার স্টীম এঞ্জিন একসাথে ফুঁসছে যেন।

নিচে পড়েই সেখানকার পানিকে বাষ্পাকারে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে জমে যাচ্ছে লাভা। জমাট বাঁধা লাভার উপর পড়ছে আরও তরল লাভা, এগিয়ে যাচ্ছে, সামনের পানিতে বাধা পেয়ে জমে যাচ্ছে। আবার ওগুলোর ওপর দিয়ে এগিয়ে

যাচ্ছে আরও পেছনের লাভাস্রোত। হ্রদের পানিকে আকাশে ওড়াতে ওড়াতে বিরামহীন ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে ওই অপরাজেয় তরল আগুন। শেষ পর্যন্ত হেরে গেল হ্রদের পানি। এককালের বিশাল হ্রদের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল জমাট লাভার দেয়াল। চোখের সামনে দৃশ্য পরিবর্তন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল অভিযাত্রীরা।

রাতেও জাহাজ তৈরির কাজ চালিয়ে গেল অভিযাত্রীরা আলোর অভাব নেই। সারারাত অতিকায় মশাল জ্বালিয়ে এলাকাটাকে দিনের মত করে রাখে আগুনে পাহাড়। আপাতত লাভা বেরোনো বন্ধ হয়েছে। তবে আবার বেরোনোর আশঙ্কাটা রয়েই গেছে।

পঁচিশ থেকে তিরিশে জানুয়ারি—ছ'দিনে বিশ দিনের কাজ করে ফেলল অভিযাত্রীরা। মার্সি নদীর তীরে এসে ঠাঁই নিয়েছে ওরা, গ্র্যানাইট হাউসে থাকা এখন আর নিরাপদ নয়।

লিঙ্কন দ্বীপের আগের সেই চেহারা আর নেই। এককালে যা নিবিড় সবুজে ঢাকা ছিল এখন তা ধূসরতায় ছেয়ে গেছে। হ্রদ, নদী—সব গ্রাস করেছে লাভাস্রোত। খাবার পানির অভাব দেখা দিয়েছে সমস্ত দ্বীপ জুড়ে।

সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে দ্বীপের পশ্চিম অংশের। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বিশাল বনভূমি। এখানে ওখানে ভূতের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কালো পোড়া গাছের কাণ্ড। জাগুয়ার, ক্যাপিবারা, পেকারি, কোয়ালা আর অন্যান্য সব বুনো জানোয়ারের দল প্রাণ ভয়ে পালিয়েছে জলাভূমির দিকে।

আরও বিশ দিন পেরিয়ে গেল। আর মাসখানেক কাজ করতে পারলেই সাগরে ভাসানো যাবে জাহাজ। কিন্তু এই এক মাস টিকে থাকবে তো টলমল লিঙ্কন আইল্যাণ্ড!

আরও দিন গেল। আর মাত্র দশদিন টিকে থাকতে পারলেই এ যাত্রা বেঁচে যাবে অভিযাত্রীরা। কিন্তু সময় দিল না আগ্নেয়গিরি। মার্চের প্রথম সপ্তাহেই তাণ্ডব কাণ্ড শুরু করে দিল সে। এবার আরও প্রলয়ঙ্করী রূপে পিচকারি দিয়ে পানি ছিটানোর মত সবেগে আকাশে উঠে গেল তরল লাভার স্রোত। সেখান থেকে হাজার হাজার কাঁচের সুতোর মত ঝরে পড়তে লাগল নিচে। কিন্তু এই করেই ক্ষান্ত হলো না আগুনে পাহাড়। জ্বালামুখ দিয়ে আবার গড়িয়ে এল বিরামহীন লাভার স্রোত, এবার আগের চাইতেও বেশি। পোলট্রি হাউস ছাড়িয়ে লাভার স্রোত গিয়ে পৌঁছল প্রসপেক্ট হাইট পর্যন্ত।

পোলট্রি হাউসের মাথায় ছানা আর ডিমের শোকে হাহাকার করে উড়ে বেড়াতে লাগল পাখির দল। প্রসপেক্ট হাইটের ওপর থেকে লাভার স্রোত জলপ্রপাতের আকারে নামতে লাগল সাগরে। আর আশা নেই, ওই অসমাপ্ত জাহাজকেই সাগরে ভাসাতে হবে। ঠিক হলো পরদিন ভোরে নামানো হবে জাহাজ। কিন্তু ভোর হবার আগেই ঘটে গেল চূড়ান্ত অঘটন।

মাঝ রাতের দিকে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ভলকে ভলকে কালচে বাষ্প বেরিয়ে এল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে। একটু পরই রাশি রাশি পাথর ছিটকে পড়ল আকাশে। ফেটে গেছে ডাক্কার গহ্বরের দেয়াল।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো আবার···আবার···আবার। আকাশ বাতাস থরথর করে কেঁপে উঠল কানে তালা লাগানো শব্দে। দেখতে দেখতে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল ফ্র্যাঙ্কলিন হিল। কিন্তু থামল না বিস্ফোরণের শব্দ। পরিষ্কার টের পেল অভিযাত্রীরা, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে লিঙ্কন আইল্যাণ্ড।

ভোর হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের সীমারেখা একদিন

যেখানে ছিল একটা বিশাল দ্বীপ, সেখানে এখন উথালপাতাল নাচছে সাগরের ঢেউ

বিশাল সাগরের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটা পাথুরে দ্বীপ। লম্বায় তিরিশ ফুট, চওড়ায় বিশ ফুট আর সমুদ্র সমতল থেকে বড়জোর ফুট দশেক উঁচু হবে এই গ্র্যানাইটের দ্বীপটা—লিঙ্কন দ্বীপের একমাত্র ধ্বংসাবশেষ।

ওটার ওপরই ঠাঁই নিয়েছেন অভিযাত্রীরা। অগ্নুৎপাতের ফলে মারা গেছে দ্বীপের সমস্ত জন্তু জানোয়ার। অবিশ্বাস্য ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে ছ'জন লোক আর একটি কুকুর। বিস্ফোরণের সময় পাথর চাপা পড়ে মারা গেছে জাপ। তখন মার্সি নদীর পাড়ে তাঁবুর ভেতরে ছিল অভিযাত্রীরা। হঠাৎ ওরা টের পেল তাঁবুতে পানি ঢুকছে। দেখতে দেখতে বেড়ে গেল পানি। তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সবাই। কিন্তু যাবে কোথায়? চারদিকে থই থই করে নাচছে সাগরের ঢেউ। পানির তলায় চলে গেছে লিঙ্কন দ্বীপ। শুধু গ্র্যানাইট হাউসের ওই ধ্বংসাবশেষটুকু এখনও জেগে আছে পানির ওপর। সাঁতরে গিয়ে ওটাতে উঠেই কোনমতে প্রাণ বাঁচাল অভিযাত্রীরা

এই পাথরের টুকরোর ওপরই একে একে কাটাল ওরা দীর্ঘ নয়টি দিন। খাদ্য নেই, পানি নেই। শুধু পাথরের খাঁজে আটকা পড়া পানিটুকু ছিল ওদের সম্বল। এখন তাও ফুরিয়েছে।

ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে জাহাজটা। কঠিন পাথরের টুকরোর ওপর বসে বসে মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া করার কিছুই নেই। কেটে গেল আরও পাঁচটা দিন। তৃষ্ণায় অনাহারে কাহিল হয়ে পড়েছে ওরা। শেষ পর্যন্ত উঠে বসার শক্তিটুকুও রইল না কারও শরীরে।

প্রলাপ বকতে শুরু করেছে নেব আর হার্বার্ট। বড় জোর আর একটা দিন টিকবে ওরা। ওদেরকে একটু সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বহু কষ্টে উঠে বসল আয়ারটন। ঠিক সেই সময় ওর চোখে পড়ল জিনিসটা।

আকাশ আর সাগরের সঙ্গমস্থলে দেখা যাচ্ছে একটা কালো বিন্দু। আস্তে আস্তে বিন্দুটা বড় হলো, বড় হতে হতে একটা জাহাজের রূপ নিল। এদিকেই আসছে জাহাজটা।

ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল আয়ারটন, 'ডানকান!' উঠে দাঁড়াতে গিয়েও পারল না সে, পড়ে গেল জ্ঞান হারিয়ে। অন্যরা জ্ঞান হারিয়েছে আগেই।

ডানকানের সুসজ্জিত কেবিনে জ্ঞান ফিরল অভিযাত্রীদের। জ্ঞান ফিরে পেতেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের খোঁজ করলেন হার্ডিং। খবর পেয়ে কেবিনে এসে ঢুকলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন।

'জাহাজটার নাম কি, ক্যাপ্টেন?' জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলেন হার্ডিং।

'ডানকান।'

'ডানকান, মানে লর্ড গ্লেনারভনের জাহাজ, ডানকান?' বিস্মিত হলেন হার্ডিং।

'হ্যাঁ, আমি লর্ড গ্লেনারভনের ছেলে, রবার্ট গ্র্যান্ট।' উত্তর দিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন।

'কিন্তু আপনার তো আয়ারটনের খোঁজে ট্যাবর আইল্যাণ্ডে যাবার কথা দেড়শো মাইল উত্তর-পুবে এসেছেন কি করতে?'

'আপনাদের খোঁজে, ক্যাপ্টেন হার্ডিং।'

'আমাদের খোঁজে? আমরা এখানে আছি কে বলল আপনাকে? আমার নামই বা জানলেন কি করে?'

'মানে?' অবাক হলেন গ্র্যান্ট, 'ট্যাবর আইল্যাণ্ডে আপনারা যে নোটিস রেখে এসেছেন ওতেই তো আপনাদের নাম, ধাম, লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের অবস্থান সব রেখে এসেছেন।' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন তিনি। এগিয়ে দিলেন হার্ডিংয়ের দিকে, 'এই যে, এটা আপনারা রেখে আসেননি?'

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলেন হার্ডিং, একনজর দেখেই বুঝতে পারলেন বোতলে পাওয়া কাগজের লেখা আর এ লেখা একই হাতের। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁ, বুঝেছি। আমাদের এই উপকারটুকুও করে গেছেন ক্যাপ্টেন নিমো।'

মাথা ঝাঁকাল পেনক্র্যাফটও। বলল, 'আমিও বুঝেছি বন-অ্যাডভেঞ্চারের দড়ির বাঁধনে অন্য গিট ছিল কেন। আসলে বন-অ্যাডভেঞ্চারে করেই ট্যাবর দ্বীপে গিয়ে নোটিস রেখে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন নিমো। ফিরে এসে আবার যথাস্থানে নৌকোটাকে বেঁধে রেখেছিলেন তিনি। গিটটা তাই আমার দেয়া গিটের চেয়ে অন্যরকম ছিল।'

'নিজে সাঙ্ঘাতিক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আর একবার প্রাণ বাঁচিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন নিমো। এসো তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ঈশ্বরের কাছে দোয়া চাই আমরা।' বলে নিজের মাথার টুপি খুলে নিলেন হার্ডিং। আর সবাইও তাই করলে হাতজোর করে গভীর কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন, 'May the God mercy have had pity on the soul of Captain Nemo, our benefactor.
(মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের উপকারী বন্ধু ক্যাপ্টেন নিমোর আত্মার মঙ্গল করুন)

হঠাৎ কি মনে পড়তেই পকেট থেকে একটা ছোট্ট বাক্স বের করে হার্ডিংয়ের দিকে বাড়িয়ে ধরল আয়ারটন। ক্যাপ্টেন নিমোর সেই হীরের বাক্সটা। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়েও বাক্সটার কথা ভোলেনি সে, সযত্নে রক্ষা করেছে। হাত বাড়িয়ে আয়ারটনের হাত থেকে বাক্সটা নিলেন হার্ডিং। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল রবার্ট গ্র্যান্টের ওপর। গ্র্যান্টের কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। এবার নজর পড়তেই বললেন হার্ডিং, 'দেখুন, ক্যাপ্টেন, এক মহাপাপীকে রেখে গিয়েছিলেন ট্যাবর আইল্যাণ্ডে। সেই একযুগ আগে রেখে যাওয়া আয়ারটনের সাথে আজকের আয়ারটনের কোন তুলনা হয় কি?'

কোন উত্তর দিতে পারলেন না ক্যাপ্টেন রবার্ট গ্র্যান্ট। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর নীল জলরাশি ভেদ করে তখন আমেরিকার দিকে এগিয়ে চলেছে ডানকান।

* * *